আমার আম্মা

[আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর আম্মা মরহুমা সাইয়েদা খায়রুন-নেসা (র)-র আদর্শ জীবন-কাহিনী]

সংকলন
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

মজলিস-নাশরিয়াত-ই ইসলাম
ঢাকা-চট্টগ্রাম

আমার আম্মা

সংকলন ঃ
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ ঃ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশনায় ঃ
মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম
ঢাকা-চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল ঃ
শাবান ১৪১৯ হি.
পৌষ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং.

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
হক প্রিন্টার্স ঃ ১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ ঃ
শেখ তোফাজ্জল হোসেন

পরিবেশনা ঃ
হক লাইব্রেরী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা।
২ ডলার।

নারী জাতির আদর্শ হযরত উম্মাহাতু'ল-মু'মিনীন (রা),
হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চার কন্যা এবং
মহিলা সাহাবীদের আরওয়াহ' মুবারকের উদ্দেশে

অনুবাদকের আরজ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর যে, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক (মুফাক্কির-এ ইসলাম) ও রূহানী মার্গের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (দা.বা.) সংকলিত তাঁরই মরহুম আম্মা খায়রুন-নেসা 'বেহতর'-এর অমর জীবন-কাহিনী 'যিক্‌র-এ খায়র'-এর বাংলা তরজমা 'আমার আম্মা' প্রকাশিত হল। দরূদ ও সালাম আখেরী নবী সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুললিল-আলামীন শাফীউল মুযনিবীন আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর যাঁর ওসীলায় হেদায়েতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে আমরা ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়েছি।

গত সফরে মাহে রমযানুল মুবারকে দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ (র), রায়বেরেলীতে আমার মুহতারাম রূহানী উস্তাদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী দামাত বারাকাতুহুম-এর মুবারক সান্নিধ্যে অবস্থানের তৌফীক লাভ ঘটে। এ সময় লাদাখনিবাসী পীর ভাই হযরতের খলীফা মাওলানা ওমর নদভীর মাধ্যমে 'যিক্‌র-এ খায়র'-এর একটি কপি আমার হাতে আসে ও পাঠের সুযোগ পাই। বলতে দ্বিধা নেই যে, উম্মাহাতু'ল-মুমিনীন (রা), হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চার কন্যা, বিশেষত হযরত ফাতেমাতু'য-যাহরা' (রা) ও মহিলা সাহাবীদেরসহ্‌ প্রখ্যাত তাপসী হযরত রাবে'আ-বসরী (র)-র পর এমন আরেকটি জীবন-কাহিনী পড়ার সুযোগ ঘটেনি। ইসলামের আবির্ভাব ও মহান সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর বিদায়ের তেরশত বছর পর এই যুগে ইসলামের কেন্দ্রভূমি হেজায মুকাদ্দাস থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভারতীয়-উপমহাদেশে এরকম একজন মহিলার জন্ম হওয়া ইসলামের অতুলনীয় কারামতই বটে। কুরআন পাকের হাফেজা ও স্বভাব কবি এই মহিলা কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই কেবল পারিবারিক পরিবেশে সামান্য লেখাপড়া শিখে, অতঃপর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, এক কথায় তার নজীর মেলা ভার। পরিবারের সীমিত পরিবেশের ভেতরে অবস্থান করেও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সম্পর্কে তিনি যে

বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হন তা থেকে তাঁর অপূর্ব মেধা ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। স্বভাবে সৎ, মেযাজে নেক, ইবাদত-বন্দেগীতে একনিষ্ঠ, আল্লাহ্‌র স্মরণে নিবেদিত ও তাঁরই মুহব্বতে নিমজ্জিত এই মহিলার জীবন-কাহিনীর যেই চিত্র পাওয়া যায় তাতে বিস্ময় না জেগে পারে না যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এই ফেতনা-ফাসাদ ও পাপাচারের যুগে, বস্তুবাদের বিজয়ের কালে এবং দীন-ধর্মের প্রতি সাধারণ অবহেলার সময়ে যদি ঈমানী কুওত ও দীনদারীর এমন নজীর মেলে তাহলে ইসলামের প্রথম যুগের মহিলারা কেমন ছিলেন। এধরনের নারীরাই আমাদের আদর্শ আর এঁদের জীবন-কাহিনী থেকেই আমাদের মা, বোন ও কন্যারা তাদের চলার পথের প্রয়োজনীয় পাথেয় ও দিক-নির্দেশনা খুঁজে নিতে পারে, পেতে পারে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার প্রেরণা।

আমাদের নারীদের সামনে আজ এ ধরনের মহিলাদের আদর্শ নেই। তাদের সামনে কোন দিক-নির্দেশনাও নেই। আর তাই হাল-বিহীন নৌকার মত স্রোতের অনুকূলে তারা ভেসে চলেছে। অনেকে ভোগবাদী পাশ্চাত্যকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এরা ঘরে নয়, পরিবারে নয়, ঘর ও পরিবারের বাইরে শান্তির খোঁজে ছুটতে শুরু করেছে। অনিবার্য কারণেই এরা নিজেরাও শান্তি থেকে যেমন বঞ্চিত থাকছে, তেমনি বঞ্চিত করছে তাঁর স্বামী, সন্তান ও পরিবারকে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদের অধিকাংশের ঘরে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ জ্বলছে। ফলে এসব পরিবার থেকে ভাল কিছু, সমাজ, দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর কিছু বেরিয়ে আসছে না। যেই মায়েরা একদিন ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম, তারিক ইব্‌ন যিয়াদ, ইমাম বুখারী, আবদুল কাদির জিলানী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম বুখারী, সুলতান সালাহুদ্দীন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, সুলতান মাহমূদ গযনবী, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ, ইমাম গাযালী, জালালুদ্দীন রূমী, হযরত শাহ্‌জালাল মুজার্রাদ (র) প্রমুখের মত মহাপুরুষ ও মহামনীষীর জন্ম দিয়েছিল– আজ তারা তেমন সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। কিন্তু কেন? আম্মা যরগুনা খাতুনের মত মা আজ কোথায় যিনি পানিপথের তৃতীয় মহাসমরে পুত্র আহমদ শাহ্ আবদালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরাজিত ও বন্দী হবার খবর শুনে আবদালীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"অসম্ভব! আমার ছেলে পরাজিত ও বন্দী হতে পারে না। হয় সে গাযী হবে, নইলে শহীদ হবে; এর অন্যথা নয়। কেননা আমি তোমাদের দু'ভাইকে কখনো বিনা ওযূতে বুকের দুধ পান করাই নি।"

যরগুনা খাতুনের ধারণাই সত্য হয়েছিল। দু'ভাই-ই বিজয়ী হয়েছিলেন, হয়েছিলেন গাযী। কুফরী শক্তির মুকাবিলায় মুসলিম শক্তি জয়লাভ করেছিল।

আমাদের সামনে এই আদর্শ নারী চরিত্রের অভাব। এই অভাব আমাদের মেটাতেই হবে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বইটি তরজমার ব্যাপারে আমি আমার মুহতারাম হযরত দামাত বারাকাতুহুমের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি সানন্দে কেবল মৌখিক নয় লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর মুহতারাম হযরত নদভী দামাত বারাকাতুহুমের অপর একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির তরজমা সম্পন্নের পর, যা চট্টগ্রামের নানুপুর মাদরাসা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আর-রশীদ' পত্রিকায় অনেকগুলো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল– বর্তমান বই-এর তরজমার কাজ হাত দিই। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী বইটি এখন সহৃদয় আগ্রহী পাঠকের হাতে। এক্ষণে যেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে এর অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে বইটি কিছুমাত্র সফল হলেও আমি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আর প্রকৃত সার্থকতা দানের মালিক তো আল্লাহ্‌ই।

বইটি প্রকাশের পেছনে অনেকের অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। বই-এর মুখবন্ধ অংশটুকুর তরজমা করেছেন আমার সহকর্মী বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল। কবিতা অংশের কাব্য তরজমা করেছেন বন্ধুবর মুহতারাম আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং একটি প্রুফ ও সেই সঙ্গে এর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেছেন বিশ্বকোষ বিভাগের প্রকাশনা কর্মকর্তা আমার সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মদ মূসা। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে সাধারণ ধন্যবাদ না জানিয়ে সকলের ইহলৌকিক সাফল্য ও পারলৌকিক কামিয়াবীর জন্যই দো'আ করাটাকেই আমি বেহতর ভাবছি। এ বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মজলিস নাশরিয়াত-এ ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই ও সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। আল্লাহ্ রাব্বু'ল-আলামীন আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসকে কামিয়াব করুন। আমীন!

আহকার

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

আমার মরহূমা আম্মা সাইয়েদা খায়রুন্নেসা জুমাদাল-আখিরা ১৩৮৮ হি. ৩১শে আগস্ট, ১৯৬৮ সালে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব কেবল তাঁর সীমিত খান্দানেই নয়, বরং বর্তমান যুগের মুসলিম কিশোরী ও গৃহবধূদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং অতীত যুগের (যা ছিল বড়ই কল্যাণ ও বরকতের যুগ) নেক মেযাজ ও সৎ স্বভাব, খোদাভীরু ও আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী মুসলিম মহিলা এবং নেক্‌কার ও ইবাদতগুযার মহিলাদের জন্য স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দৃঢ় ঈমান ও ইয়াকীন, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহ, নিজের ও নিজ সন্তানদের ক্ষেত্রে দুনিয়ার ওপর দীনকে খোলামেলাভাবে প্রাধান্য দান, দুনিয়ার সম্পদ, মর্যাদা ও সাজ-সজ্জার প্রতি অনীহা, সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও অল্পে তুষ্টি, দো'আ ও মুনাজাতের প্রতি ভালবাসা, দো'আর আছর ও গ্রহণযোগ্যতা, আল্লাহ্‌র কালাম ও রাসূল (স.)-এর যিকরসমূহের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেগুলিকে মনোবাঞ্ছা পূরণ ও দুনিয়ার সৌভাগ্য ও কামিয়াবীর মাধ্যম এবং সকল বন্ধ দুয়ারের তালার চাবিস্বরূপ মনে করা, দো'আর উত্তাপ ও কোমলতা, নামাযের অন্তর্নিহিত স্বাদ ও আবেদন, দীন ও দীনদার লোকদের সম্মান ও মর্যাদা তাঁর শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়া এবং স্বভাবে পরিণত হয়ে যাওয়া পূর্বসুরীদের সময়কাল এবং ইসলামের ইতিহাসের সেসব সম্মানিত মহিলার স্মরণ তাজা ও চাঙ্গা করে তুলত, স্মারক ও জীবনী গ্রন্থসমূহে যাঁদের কাহিনীসমূহ লিখিত ও পঠিত হয়ে থাকে। তাঁকে দেখেই অনুমান করা যেত যে, ফেতনা- ফাসাদ ও পাপাচারের এই যামানায় এবং বস্তুবাদ ও দীনের প্রতি অবহেলার এই সময় পর্বে যদি ঈমানী শক্তি ও দীনদারীর এমন নমূনা পাওয়া যায় তবে প্রথম যুগের ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের সেসব মহিলাদের অবস্থা কীরূপ ছিল যাঁরা তা'লীম ও তরবিয়ত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)-এর সর্বোত্তম পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই আঁচ করা যায় যে, প্রথম যুগের সে সব নেক্‌কার, ইবাদতগুযার, আলেম ও বিদুষী মহিলাদের সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে সে সব কাহিনী ও জীবন-চরিতের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও বাড়াবাড়ি বা কল্পকাহিনী রচনার মানসিকতা নেই।

আম্মার ইনতিকালের দু'মাস পরই মাসিক "রিযওয়ান" লাখনৌয়ের (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৮ খৃ. মুতাবিক শাবান-রমযান ১৩৮৮ হি. সংখ্যা) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, যা ছিল মূলত তাঁর জীবনী, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁর মূল্যবান বাণী ও রচনাবলীর আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত। মুসলিম মহিলাদের এ পত্রিকাটি

তাঁর খান্দানের লোকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক তাঁর দৌহিত্র মৌলভী সাইয়েদ মুহাম্মদ ছানী হাসানী সাল্লামাহু এবং সহযোগী সম্পাদক মরহূমার কন্যা আমার সহোদরা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা। এ সংখ্যাটি ছিল বড় সাইজের ৯৬ পৃষ্ঠাসম্বলিত। পত্রিকাটির নিবন্ধ রচনা, সম্পাদনা ও বিন্যাসে তাঁরই সন্তান-সন্ততি এবং তাঁরই খান্দানের লোকজন অংশগ্রহণ করে, যারা তাঁর জীবন-চরিত ও কামালিয়াত, কাজকর্ম, দৈনন্দিন ইবাদত ও আমলসমূহ সম্পর্কে সবচে' বেশী অবগত এবং তার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন।" রিযওয়ান"-এর এ সংখ্যাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এর সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বহু লোক এটাকে গ্রন্থের মত সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং বহু আগ্রহী পাঠক এখনো এর চাহিদা ব্যক্ত করে থাকেন যা তাদেরকে সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আগ্রহী ও গুণগ্রাহীদের এরূপ আগ্রহ ও কামনা দেখে এবং আমি নিজেও এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাবের কথা উপলব্ধি করে একে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে মনস্থ করলাম যাতে সর্বস্তরের জনগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং একখানি গ্রন্থের আকৃতিতে তা ঘরে ঘরে ও লাইব্রেরীসমূহে সংরক্ষিত হয়। এখন যখন মরহূমার নির্বাচিত স্বরচিত দো'আর সংকলন (যা তাঁর জীবদ্দশায় প্রথমত "বাব-ই রহমত" এবং পরবর্তীতে "কলীদ-ই বাব-ই রহমত" নামে দুই ভাগে প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল) ভক্ত ও আগ্রহীদের আগ্রহ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে "কলীদ-ই বাব-ই রহমত" নামে পুন:প্রকাশ করা হচ্ছে। এ সংখ্যাটিই পুন:নীরিক্ষা, যাচাই-বাছাই ও সংযোজন-বিয়োজনসহ "যিক্র-ই খায়ের" নামে প্রকাশ করা হল। এর সবগুলি লেখা তাঁর নিকটাত্মীয় এবং রাত-দিন তাঁকে যারা দেখেছেন, খান্দানের সে সকল লোকের রচিত আর এ সবই "রিযওয়ান" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি "যিকর-ই খায়ের" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত লেখাগুলো মূল্যবান হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং আগ্রহভরে পঠিত হবে, আর এর দ্বারা নিজের মধ্যে নেক প্রভাব ও অবস্থা পয়দা করা এবং বাচ্চাদের তালীম ও তরবিয়তের কাজে সাহায্য নেয়া হবে। গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মরহূমার জন্য মাগফিরাত এবং তাঁর দরজা বুলন্দীর জন্য দো'আ করার আবেদন রইল। আর সেই সঙ্গে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও খান্দানের লোকদেরকেও উক্ত দো'আয় শরীক করার আশা ও আবেদন রইল।

والله ولى التوفيق

আবুল হাসান আলী নদভী

৭ই সফর, ১৩৯৪ হি.

২রা মার্চ, ১৯৭৪ খৃ.

সূচিপত্র

আমার আম্মা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

হযরত শাহ্ যিয়াউন নবী

আমার নানা হযরত সাইয়েদ শাহ যিয়াউন নবী (র) হযরত শাহ আলামুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলায়হের সপ্তম অধস্তন পুরুষ। হযরত শাহ আলামুল্লাহ ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হের প্রখ্যাত খলীফা হযরত সাইয়েদ আদম বিন্নুরীর বিশিষ্ট খলীফাদের একজন। ১০৯৬ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। রায়বেরেলী শহরের বাইরে সাই নদীর ধারে অবস্থিত বস্তি "দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ" এই মহান বুযুর্গের নাম ধারণ করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত মুজাহিদ ও সংস্কারক হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র) তাঁরই পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। তিনি তাঁর যুগে আল্লাহ্‌র একজন কামেল ওলী ছিলেন, ছিলেন সুন্নাতের অনুসরণকারী বুযুর্গ ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ।[১]

হযরত শাহ যিয়াউন নবী (র) অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় সম্পদেই সম্পদশালী করেছিলেন। হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র)-এর তরীকায় তিনি খিলাফত লাভ করেছিলেন। তাঁর মুরীদদের মধ্যে বড় বড় আলেম ও বুযুর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে কোন লোক তাঁকে দেখলে অনুভব করতে পারত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একমাত্র তাঁর স্মরণ ও পারলৌকিক জগতের জন্যই পয়দা করেছিলেন। তিনি যেভাবে একাগ্রচিত্তে ও গভীর তন্ময়তার সঙ্গে নামায পড়তেন তা আশেপাশের ও নিকটজনদের কাছে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। নামাযের নিয়ত বাঁধার পর এমনভাবে তিনি নামাযের মধ্যে ডুবে যেতেন যে, দুনিয়ার কোন কিছুর খবরই তাঁর থাকত না। শেষ বয়সে তাঁর কাঁপুনি রোগ দেখা দিয়েছিল। হাঁটতে

---

১. সাইয়েদ শাহ 'আলামুল্লাহ হাসানী (র) সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে গোলাম রসূল মেহের লিখিত 'সাইয়েদ আহমদ শহীদ', মৎপ্রণীত 'সীরাত-ই সাইয়েদ আহমদ শহীদ' এবং মুহাম্মাদ হাসানী লিখিত 'তাযকিরা হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ' পড়ুন।

কিংবা চলতে গেলে মনে হ'ত এই বুঝি তিনি পড়ে যান। কিন্তু নামাযের কাতারে দাঁড়ালে এবং ইমাম তাকবীর বলতেই তিনি এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন যে, মনে হ'ত একটা নিশ্চল কাঠের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কখনো রাত্রিকালীন নামাযে অংশ নিতেন এবং দাঁড়িয়ে (নামাযরত অবস্থায়) গোটা কুরআন মজীদ শুনতেন। অনেক ভাল ভাল সুস্থ সবল যুবকদের দেখা গেছে যে, তারা ক্লান্ত হয়ে বসে গেছে, কেউবা সালাম ফিরিয়ে জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে গেছে, আবার কেউ-বা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, কিন্তু তিনি পাথরবৎ দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জায়গায়, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। দূর থেকে মনে হবে কেউ যেন এক খণ্ড কাঠ পুঁতে রেখেছে। এক ওয়াক্ত নামাযের পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁর সান্নিধ্যের এমনই প্রভাব ও বরকত ছিল যে, কেউ কয়েক দিন তাঁর সান্নিধ্যে উঠাবসা করলে তার নামাযের প্রতি আসক্তি জন্মে যেত, সুন্নাতে রসূল (স)-এর প্রতি আগ্রহ জন্মাত এবং সেও এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকত। অনেক সময় বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু তাতে তাঁর মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক ও নিমগ্নতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা দেয়নি। অনেকগুলো সন্তানের মা-এমন কন্যা সন্তান যৌবনে মারা গেছে, যখন খবর এসেছে তখন তিনি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। একবার কেবল 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজি'উন' পড়েছেন, তারপর আবার কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছেন।

পৈতৃক সূত্রে তিনি অনেক জমিজমা পেয়েছিলেন। কয়েকটি গ্রামের জমিদারীর মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ও তাঁর ভাই সাইয়েদ রশীদুদ্দীন লাভ করেছিলেন। তাঁদের কোন বোন ছিল না। সময়টা ছিল ইংরেজ আমলের প্রথম দিক। সে সময় দেশে বেশ প্রাচুর্য ছিল। জিনিসপত্রের কোন অভাব ছিল না। কাজেই তিনি বেশ নিশ্চিন্তেই ইবাদত-বন্দেগীর ভেতর দিয়ে কাল কাটাতে থাকেন। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। কেবল একটা জিনিসের প্রতি গভীর আগ্রহ ও প্রবল আসক্তি দেখা যেত, আর তা হল ধর্মীয় বই-পুস্তক। কোথাও ধর্মীয় কোন বই-এর খবর পেলে কিংবা এর কোন ইশতিহার দেখলে অমনি তিনি তা সংগ্রহের জন্য উঠেপড়ে লাগতেন এবং প্রয়োজনীয় অর্ডার দিতেন। অতঃপর অধীর আগ্রহে দিন গুনতে থাকতেন। এই আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, একবার তিনি এমনি এক বই-এর অর্ডার পাঠিয়ে যখন তার অপেক্ষায় দিন গুণছিলেন সে সময় তাঁর কোন কন্যা কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়

মারা যায়। দাফন অনুষ্ঠানে তিনি শরীক ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সাইয়েদ উবায়দুল্লাহকে ডেকে বলেন, "উবায়েদ! বইটা তো এখনও এসে পৌঁছল না?" পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাঁর এ ধরনের উক্তিতে অত্যন্ত বিস্মিত হয় যে, এমনতরো মুহূর্তেও তাঁর মন বই-এর চিন্তায় ডুবে আছে? বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা ও খোঁজখবর নেবার দিকে তাঁর এতটুকু আগ্রহ ছিল না। এর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কও ছিল না। যতদিন তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ রশীদুদ্দীন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন সব কিছুর মালিক-মোখতার। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে অর্থাৎ আমার নানার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র মওলভী সাইয়েদ খলীলুদ্দীনের ওপর এ সবের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমার নানার অন্য কিছুর প্রয়োজন ছিল না। কেবল কোন কিতাব কেনার দরকার হলে তাঁর টাকার প্রয়োজন দেখা দিত কিংবা ছোটদের কিছু উপহার-উপঢৌকন কিংবা কাউকে হাদিয়া-তোহফা দিতে চাইলে টাকার প্রয়োজন অনুভব করতেন। তাছাড়া তাঁর আর কোন খরচ ছিল না। জমিদারীর হাজার হাজার টাকা আয়-আমদানী সত্ত্বেও মাসোহারা হিসেবে তিনি কেবল দশ টাকা নিতেন।

অপরদিকে মুরীদদের বেলায় তাঁর হিসেব ছিল এর উল্টো। অন্যান্য পীর-বুযুর্গ যেভাবে এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরতেন এবং মুরীদদের বাড়ি বাড়ি যেতেন, তাদের থেকে নযর-নেয়ায গ্রহণ করতেন, তিনি তেমন ছিলেন না। তাঁর মুরীদদের ভেতর ধনী-গরীব, আলেম-ফাযেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব ধরনের লোকই ছিল। এসব মুরীদই বরং তাঁর খেদমতে আসত এবং সপ্তাহ নয়, কোন কোন সময় মাসাধিক কাল মেহমান হিসেবে অবস্থান করত। কালে-ভদ্রে কোথাও কখনো গেলে কেবল জৌনপুর যেতেন যেখানে তাঁর এক প্রিয় মুরীদ মওলভী মাক্কী থাকতেন। মওলভী মাক্কীর আসল নাম ছিল আবুল খায়ের। মক্কা মু'আজ্জামায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তিনি এ নামেই সকলের নিকট পরিচিত হন ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। মওলভী মাক্কীর আব্বা মওলানা সাখাওয়াত আলী জৌনপুরী তাঁর যুগের অন্যতম বিখ্যাত আলেম ও মুদাররিস এবং সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। মওলভী মাক্কীর ছেলে মাওলানা আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ শীছ ফারূকী দীর্ঘকাল যাবত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান ছিলেন। সে যাই হোক, আমার মা বলতেন যে, মিঞা মওলভী মাক্কী আমাদের বাড়িতে এলে আব্বা সব চাইতে বেশী খুশী হতেন। তিনি এলে বাড়ির চেহারাই যেন পাল্টে যেত এবং সব কিছুই প্রাণ ফিরে পেত ও রওনকময় হয়ে উঠত। মওলভী মাক্কী এবং তাঁর

গোটা পরিবারের সঙ্গেই আমার নানার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক শেষ অবধি বজায় ছিল।

খান্দানের মহিলারা

সেই যুগটাও ছিল বড়ই কল্যাণ ও বরকতের যুগ। বুযুর্গদের প্রভাব খান্দানের ভেতর পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল। আমার নানী ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় আকীদার অধিকারী নেককার, সময়নিষ্ঠ, ধার্মিকা, বুদ্ধিমতি ও সমঝদার মহিলা। অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নানা তাঁকে আরও লেখাপড়া শেখান। ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ সে যুগের রেওয়াজ ও মানের দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় আমার নানীর বেশিই ছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করত এবং তাঁর মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ববহ মনে করা হত। সে যুগে আমাদের খান্দানে দু'জন মহিলাকে তাঁদের শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান, জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলে মনে করা হত। এঁদের একজন ছিলেন আমার নানী এবং অপরজন ছিলেন আমার দাদা মৌলভী হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন সাহেবের মা ফাতেমা বিবি। ইনি সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (র)-এর খলীফা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ জাহের-এর কন্যা এবং সম্পর্কে আমার মা'র ফুফু হতেন। তাঁর সম্পর্কে আমার দাদা মৌলভী হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন তদীয় "তাযকিরাতু'ল-আবরার" নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ

"আমার মা তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা কর্তৃক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটার পর থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত ফরয, সুন্নত ছাড়াও সালাতুল-আওয়াবীন, চাশ্‌ত, ইশরাকের নামায, শাওয়ালের ছয় রোযা, মুহাররাম মাসের দশ রোযা, যিলহজ্জ মাসসহ অন্যান্য মাসের রোযা রাখা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, হাদীছ ও ফেকাহ্‌র কিতাবাদি পাঠ, দালায়েলুল খায়রাত, হিযবু'ল আ'জম, হিযবু'ল-বাহ'রসহ অন্যান্য দো'আ-দরূদের কিতাবাদি অত্যন্ত সযত্ন আগ্রহে পাঠ করতেন। এতদ্ভিন্ন মাশারিকুল আনওয়ারের তরজমা মিশকাতুল মাসাবীহ, মেফতাহুল জান্নাত, যিমানুল ফিরদাওস, হেকায়াতু'স-সালেহীন, তিব্বে ইহ্‌সানী, তিব্বে নববী, মি'দানু'ল-জাওয়াহির, রিসালা খাওয়ান-ই নি'মাত ও হংস জাওয়াহির প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"এছাড়া গৃহস্থালীর কাজ, ব্যবস্থাপনা, রান্নাবান্না, মহিলা ও বাচ্চা-কাচ্চাদের অসুখে-বিসুখে চিকিৎসা ইত্যাদিতে তিনি খুবই পারঙ্গম ছিলেন। আত্মীয়-

স্বজনের সঙ্গে সদব্যবহার ও সদাচার এবং অভাবী ও গরীব-দুঃখীদের প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতি প্রদর্শন, তাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভীতিকর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদামণ্ডিত প্রভাব ও আত্মিক প্রশান্তির ক্ষেত্রে আল্লাহপাক তাঁকে বিপুলভাবে ধন্য ও মণ্ডিত করেছিলেন।"

মা'র দেখাশোনা ও যত্ন-আত্তি করবার জন্য যেই মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনিও খুবই আল্লাহভীরু, নেক চরিত্রের ও ইবাদতগুযার ছিলেন। তাঁর নাম আমার এক্ষণে মনে নেই বটে, তবে সাধারণভাবে সকলে তাঁকে 'জাওয়া' নামেই জানত। তাঁর সদঅন্তকরণ, আল্লাহভীতি ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহের কথা তিনি খুবই বলতেন। সে যুগে অভিজাত পরিবারগুলোতে সাধারণ নিয়ম ছিল (আর আমাদের খান্দানে তো এটা রেওয়াজেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল) যে, অপরাপর পরিবার ও খান্দানের বয়োবৃদ্ধা ও বিধবা মহিলারা, যাদের দেখাশোনা করবার আপন কিংবা নিকটাত্মীয় থাকত না অথচ যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ, যিক্‌র-আযকার ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রসর, তারা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এসব বাড়িঘরে এসে উঠতেন এবং নিজেদের বাকী জীবন ইজ্জতের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ করে আখেরাতের সঞ্চয় তথা পারলৌকিক জীবনের পুঁজি সংগ্রহের ভেতর কাটিয়ে দিতেন। আমাদের খান্দানের প্রত্যেক বাড়িতেই এ ধরনের শরীফ ও ধর্মভীরু বৃদ্ধা মহিলা শত শত বছর থেকে বসবাস করে আসছেন। কিন্তু আমার নানা ও তাঁর ভাই-এর পরিবারে, যাঁরা আমাদের খান্দানের সবচে' স্বচ্ছল পরিবার ছিল, এধরনের সজ্জন ও ধর্মভীরু মহিলাদের আনাগোনা ও অবস্থান বেশিই থাকত এবং এসব মহিলার অধিকাংশই আমার নানার কিংবা খান্দানের অপরাপর বুযুর্গদের মুরীদ ছিলেন। এঁরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে খুবই মজবুত, নীতি ও নিয়মনিষ্ঠ বরকতময় মহিলা ছিলেন। তাদের কারণে ঘরের ভেতর দীনী আলোচনা ও ধর্মীয় তৎপরতা জোরদার থাকত এবং পরিবারের শিশু-কিশোরদের ওপর এর বেশ ভাল প্রভাব পড়ত।

আমার মা খায়রুন্নেসা

আমার নানার ছিল দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। আমার বড় মামার নাম ছিল সাইয়েদ আহমাদ সাঈদ এবং ছোট মামা ছিলেন মওলভী হাফেজ সাইয়েদ উবায়দুল্লাহ। আমার মা ছিলেন তাঁর বোনদের মধ্যে চতুর্থ। বোনদের তিনজন ছিলেন বয়সে তাঁর বড়, একজন ছিলেন ছোট। ছোটজন নানার জীবদ্দশায়

ইনতিকাল করেন। মা'র জন্ম হয় ১২৯৫ হিজরী/১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় খায়রুন্নেসা। মা কয়েকবারই বলেছেন এবং সকলেই এর সত্যতা সমর্থন করেন যে, নানা তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমার মাকেই বেশি স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন এবং তাঁর সঙ্গেই তিনি বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মা বলেন, বাইরে থেকে যখনই কোন ভাল বই কিংবা কিতাব নানার হাতে এসে পৌছত আমাকে তা দেখতে দিতেন এবং বই নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতেন। আর এটাই ছিল তাঁর স্নেহ-ভালবাসার প্রকাশ। মা বলতেন, আব্বা যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় কোঠার ওপর তলা থেকে নেমে মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করতেন তখন আমার ঘুম ভেঙে যেত এবং আমি ও আমার মেজো বোন সালেহা উভয়ে আমার আম্মার কাছে ওপর তলায় চলে যেতাম। এবং সেখানেই মা'র সঙ্গে নফল নামায পড়তাম। আমাদের অন্যান্য বোন ও সঙ্গী-সাথী এ ব্যাপারে আমাদের দু'জনকে খুবই ঈর্ষা করত এবং তারা আমাদের সঙ্গী হবার কোশেশ করত। কিন্তু অধিকাংশ সময় ঘুম না ভাঙায় তাদের চেষ্টা ফলবতী হত না।

মা'র রুটি বানানো, তরকারী পাকানো ও সেলাই কাজের প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর মস্তিষ্ক প্রথম থেকেই নিত্য-নতুন সৃষ্টির চিন্তায় বিভোর থাকত এবং নতুনতরো উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাঝে আনন্দ খুঁজে পেত। এসব কাজে খান্দানের ভেতর তাঁকে আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক মনে করা হত। আমার নানার মেযাজের মধ্যেও (সহজ-সরল জীবন যাপন ও ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও) সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও স্বাদের আমেজ পাওয়া যেত। সুন্দর, মানানসই ও উপযোগী জিনিস তাঁকে আকৃষ্ট করত। এজন্য মা অধিকাংশ সময় এজাতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নিতেন। নানার একটি আবা, যা তিনি ঈদের দিন পরিধান করতেন, আজও আমাদের বাড়িতে সযত্নে তোলা রয়েছে। আবার ওপর আম্মার হাতের রেশমী কারুকাজ দেখলে মনে হবে বড় মাপের কোন সুনিপুণ ওস্তাগার এইমাত্র কাজ সেরে উঠে গেছেন।

লেখাপড়া ও গভীর অধ্যয়ন

আমাদের খান্দানে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল খুবই নির্দিষ্ট ও সীমিত পর্যায়ের। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া পছন্দ করা হ'ত না। লেখাপড়া ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠ, মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানাশোনা এবং ঘর-গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। উলামায়ে হক তথা সত্যপন্থী

আলেমদের লিখিত কিতাবাদি, যা এই খান্দানের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ছিল- সেগুলোই ছিল মেয়েদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত। আমার মায়ের কাছ থেকে যেসব কিতাবের নাম বেশী শুনেছি সেগুলোর মধ্যে হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী লিখিত "মা লাবুদ্দা মিনহু" (আকীদা ও মসলা-মাসায়েল সম্পর্কিত), রাহে নাজাত, হযরত শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী লিখিত কেয়ামতের আলামতের ওপর চেহেল হাদীছ (চল্লিশ হাদীছ) এবং শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীনকৃত কুরআন পাকের তরজমার কথা আমার মনে আছে।

ফারসী ভাষার প্রাথমিক বই-পুস্তকও পড়ানো হ'ত। কিন্তু হাতের লেখার ব্যাপারে জোরও দেওয়া হ'ত না, কিংবা এর অনুশীলন (মশ্‌ক)-ও করানো হ'ত না। এ ব্যাপারে আমাদের খান্দানের কোন কোন মুরুব্বীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই কঠোর। তাঁরা বলতেন যে, মেয়েরা লিখতে শিখলে অন্যদেরকে চিঠি লিখবে। কিন্তু আমার মা'র লিখবার ও সুন্দর হস্তাক্ষরের অনুশীলনের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল অত্যধিক। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ চাচাতো ভাই মওলভী সাইয়েদ খলীলুদ্দীন, যিনি গোটা খান্দানের অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন-এর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি মা'র আগ্রহ ও ধর্মীয় আস্থাদৃষ্টে প্রয়োজন মাফিক অনুমতি দেন। ফলে মা তাঁর পরিবেশগত প্রথা এবং স্বীয় খান্দানের মানদণ্ডের বিপরীতে বেশ ভাল রকম লিখা শিখে ফেলেন। আর এটাই তাঁকে বই-পুস্তক লিখতে বেশ সহায়তা করেছিল।

এ সময় যেসব কিতাব তিনি বেশির ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যেসব গ্রন্থ তাঁর জীবন ও তাঁর মস্তিষ্কের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল সে সবের মধ্যে কাসাসুল আম্বিয়া, মাকাসিদু'স-সালেহীন, মাআছিরু'স-সালেহীন, তিব্বী আল-ফারাসিখ ইলা মানাযিলি'ল-বারাযিখ ও তারীকু'ন-নাজাত-এর নাম আমি বার বার শুনেছি। এর কিছু কাল পর আরও তিনটি পুস্তক পড়ার সৌভাগ্য তাঁর হয় যা তাঁর জীবনকে বেশ ভালরকম প্রভাবিত করে। তন্মধ্যে একটি হ'ল নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান মরহুম লিখিত কিতাবু'দ্দা' ওয়া'দ-দাওয়া যদ্দ্বারা কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের নির্দিষ্ট ও কুরআনী আমলের কথা জানতে পারি এবং তিনি সেগুলোর ভেতর থেকে অনেকগুলোকেই নিজের নিয়মিত আমলে পরিণত করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি মুজাররাবাত-ই দায়রাবী। এ গ্রন্থটি দ্বারাও তিনি উপকৃত হন। তৃতীয় গ্রন্থটি তা'বীরু'র-রু'য়া তথা খাবনামা। এতে স্বপ্নের সেইসব তা'বীর বা ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যা হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন

সীরীন (র) বিভিন্ন মানুষের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় দিয়েছেন এবং এর মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এই বইটি পড়ে, তদুপরি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আল্লাহ্‌প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা তথা তা'বীর প্রদানে মা'র এক ধরনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। খান্দানের অধিকাংশ লোক মা'র থেকেই তাদের স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করে জেনে নিত এবং ঐসব তা'বীর অনেকাংশেই ফলে যেত।

এ সময়ই এক মহা নে'মতের মত মরহুম হাতিফের কাব্যাকারের একটি মুনাজাত তিনি পান যার নাম ছিল "নে'মতে 'উজমা"। এর প্রতিটি পংক্তি আসমা'উ'ল-হুসনা (আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম গুণসূচক নামসমূহ)-র কোন একটি নাম দিয়ে শুরু হত এবং নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের দো'আ ও মুনাজাত থাকত। আমাদের জানা নেই এই হাতিফ কে ছিলেন এবং তাঁর পুরো নামটাই বা কি ছিল। কিন্তু আমাদের খান্দানের জন্য তিনি ছিলেন হাতিফ-ই গায়বী (অদৃশ্য আহ্বানকারী)। তাঁর এই মকবুল মুনাজাতের প্রতিটি ছত্র থেকে, প্রতিটি শব্দ থেকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দো'আর সত্যিকার আবেগ প্রকাশ পায়। খান্দানের মহিলা ও শিশু এবং অনেক পুরুষেরও আলোচ্য কবিতাটি নিয়মিত আমল ও ওজীফায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশেরই এটা মুখস্থ ছিল। বিশেষত যখনই কোন সমস্যা কিংবা সংকট দেখা দিত অথবা কোন পেরেশানীর কারণ ঘটত কিংবা দুঃখ-কষ্ট ও শোক বা বিষাদময় ঘটনা ঘটত তখন একাকী অথবা সমষ্টিগতভাবে কবিতাটি অত্যন্ত দরদভরে পঠিত হ'ত। এর ফলে চিত্তে প্রশান্তি আসত এবং মনটাও সজীব হয়ে উঠত।

কুরআন শরীফ হিফ্‌জ

আমাদের বংশে পুরুষদের ভেতর কুরআন শরীফ হিফ্‌জ করার প্রথা সেই শুরু থেকেই চলে আসছে এবং প্রতিটি যুগেই অনেক বড় বড় হাফেজ আমাদের খানদানে হয়েছেন। কিন্তু আমার জানা নেই এর আগে আমাদের খান্দানের মহিলাদের মধ্যে কোন হাফেজ ছিল কি না! আমার এও জানা নেই মহিলাদের মধ্যে হাফেজ হবার অর্থাৎ কুরআন মজীদ হিফ্‌জ করার আগ্রহ কখন ও কবে থেকে কিভাবে সৃষ্টি হ'ল। আমি এও বলতে পারি না যে, সর্বপ্রথম আমার মা'র মধ্যেই এই আগ্রহ প্রথম দেখা দেয়, না কি তাঁর কোন বোন কিংবা আত্মীয়ার ভেতর। তবে ১৯৫৬ সালের "মাসিক রিযওয়ান"-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, কুরআন মজীদ হিফজ করার খেয়াল আমার মা'র মনে প্রথম উঁকি দেয় এবং তাঁর দ্বারাই এই বরকতময় ধারার সূত্রপাত

ঘটে। এ সময় মা তাঁর মেজ বোন সালেহা বী, ভাগিনেয়ী এবং তাঁর আরও দুই বোন কুরআন মজীদ হিফ্জ শুরু করেন। এঁদের সকলেই তাঁদের এমন কোন আত্মীয়ের কাছে হিফ্জ শুরু করেন যারা তাদের আপন সহোদর ভাই কিংবা মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিয়েশাদী নিষিদ্ধ) হতেন। ছোট মামা সাইয়েদ আবদুল্লাহ নিজেই একজন উঁচু মানের হাফেজ ছিলেন। তাঁর কুরআন তেলাওয়াত ছিল খুবই উত্তম ও সহীহ্-শুদ্ধ। আমার মা তাঁর কাছেই হিফ্জ করতে শুরু করেন। এই দুই ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিবিড় প্রীতির ও মধুর যা খুব কম ভাই-বোনের মধ্যে দেখা যায়। তারা পরস্পরের প্রতি ছিলেন উৎসর্গীতপ্রাণ। উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল চার থেকে পাঁচ বছরের। তিন বছরেই তিনি হিফ্জ সমাপ্ত করেন। আগেপিছে সব বোনেরাই হিফ্জ শেষে হাফিজ হন। তাঁর আপন বড় চাচাতো ভাই মওলভী সাইয়েদ খলীলুদ্দীন তাঁকে (আম্মাকে) অত্যন্ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। আমার মা বলতেন, মরহুম ভাইজান আমাদেরকে দাওয়াত করতেন প্রত্যেক সপ্তাহে এবং হিফ্জ সমাপ্ত হলে বিরাটাকারে দাওয়াত করেন।

রমযানের নিয়মিত আমল

কী বরকতময় যুগ ছিল যখন তাঁরা সকলেই তারাবীহ্ নামাযে এক এক পারা করে পড়তেন। কোন কোন আলিমের ফতওয়া মুতাবিক তাঁদের নিজেদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হত যাতে মহিলা ইমাম এবং মহিলারাই মুকতাদী থাকতেন। 'এশার পর থেকে শুরু করে সাহরীর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকত। সকলেই খুব ভাল কুরআন শরীফ পড়তেন। মাখরাজ সহীহ্-শুদ্ধ ছিল। যদি ধৃষ্টতা না হয় তাহলে বলি যে, আজকাল মাদরাসার বহু মুদাররিসের থেকে অধিকতর সহীহ্-শুদ্ধ পড়তেন ও বেশ ভাল পড়তেন। আর ভেতরকার আবেগ-উৎসাহ ও স্বাভাবিক সুর-মুর্ছনা ছিল এর অতিরিক্ত। আমার স্মরণ আছে যে, একবার আমি লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার মা'র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম। তিনি সে সময় তারাবীহ্র নামায পড়ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। সেদিনকার সেই আনন্দ ও স্বাদ আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি। বিয়ের পর তিনি আব্বাকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শোনান এবং এর ভেতর অধিকতর জ্যোতি ও চমক সৃষ্টি হয়। জীবনের শেষ অবধি যতদিন তাঁর স্মরণশক্তি অটুট ছিল তিনি তাঁর আপন ভাতিজা হাফেজ সাইয়েদ হাবীবুর রহমানের কাছে নিয়মিত কুরআন মজীদের দওর (পুনপাঠ) করতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত

যতদিন তিনি তাঁর নিয়মিত আমলসমূহ আদায় করেছেন সে সবের ভেতর কুরআনুল করীমের বিভিন্ন সূরা, রুকূ' ও আয়াত অত্যন্ত সহীহ-শুদ্ধ তরীকায় একটা সীমা পর্যন্ত তাজবীদ ও বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে নিয়মিত পাঠ করতেন।

উচ্ছল আবেগ এবং দো'আ ও মুনাজাতে তন্ময়তা

এরপর এল সেই যুগ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার আম্মাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও নে'মত দ্বারা ধন্য ও অনুগৃহীত করতে চাইলেন এবং তাঁকে দো'আ ও মুনাজাতের সেইসব সম্পদ ও নিসবত দান করলেন যা তাঁর কবুলিয়ত ও উন্নতির মূল সৌন্দর্য এবং হাজারো সৌভাগ্য ও অফুরন্ত নে'মতের উপায় ও উৎসে পরিণত হয়, যার উদাহরণ আমি এই শেষ যুগে কেবল আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাহ্দের ভেতর দেখতে পেয়েছি, দেখতে পাই আমাদের পূর্বসূরী বড় বড় বুযুর্গ ও সম্মানিত মাশাইখের ভেতর।

অধিকাংশ সময় দেখা গেছে যে, যখন আল্লাহ্র কোন বান্দার ওপর আল্লাহ্র কোন বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তাঁর দিকে টেনে আনতে চান তখন যে কোন উপলক্ষ্য করে তার ভেতর এক প্রকার আকুলতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দেন। হাজারো তৃপ্তি ও প্রশান্তি উৎসর্গীত হোক এ ধরনের আকুলতার জন্য যা সকলের থেকে সরিয়ে আল্লাহ্র আস্তানার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেয়। বহু বুযুর্গানে দীনের জীবনযাত্রা দেখার সুযোগ আল্লাহ পাক এই গোনাহগারকে দিয়েছেন। অধিকাংশ সময় দেখেছি যার ওপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয় তার জীবনে ব্যাকুলতার কোন কারণ সৃষ্টি করে তাকে সকলের মাঝ থেকে তুলে নিয়ে একান্ত আপন করে নিয়েছেন। বহু বুযুর্গের অবস্থার পরিবর্তন, মোহ ও আকর্ষণের মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ এই ব্যাকুলতাই ছিল যাকে অনেকে ব্যাকুলতা নামে স্মরণ করে থাকেন। আমার মা অনেক সময় বলতেন, একবার আমি কুরআন শরীফ পড়ছিলাম। আমি এই আয়াত দেখতে পাই ঃ

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّی قَرِیْبٌ ط اُجِیْبُ دَعْوَةَ الـــــــدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ .

বহুবার এই আয়াত আমি পড়েছি এবং খুব সম্ভব তখন আমি এই আয়াতটি হিফ্জও করে থাকব। কিন্তু সে সময় অকস্মাৎ আমার যেন চোখ খুলে গেল এবং আমার মনে হল যেন হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি, নতুন

কোন সত্য আমার কাছে ধরা পড়েছে। তিনি বলতেন, মনে হচ্ছিল যেন আমার মনের পর্দার ওপর কেউ কথা কয়টি খোদাই করে দিয়েছে এবং কোন জিনিস দিলের গভীরে বসে গেছে। ব্যস, আর কি! আমি যেন কোন রাজভাণ্ডার পেয়েছি এবং ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে ধরা পড়েছে। ব্যস, আমি শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধরলাম এবং দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে কামড়ে ধরলাম। দো'আর এমন এক স্বাদ ও অনাস্বাদিত-পূর্ব তৃপ্তি অনুভব করলাম যে, আমার সমগ্র সত্তাই যেন এর দ্বারা আপ্লুত হয়ে গেল। এদিকে শুরু হল একটা ব্যাকুলতা যা আমাকে সব সময় ঘিরে রইল। জীবনের পরিণতি, ভবিষ্যতের চিন্তা, সৌভাগ্য ও সফলতা লাভের আগ্রহ ও বাসনা সব সময় আমার দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্কের ওপর ছেয়ে থাকত।

এই সার্বক্ষণিক ব্যাকুলতার ভেতর যদি কোন কিছুর দ্বারা শান্তি পেতাম তাহলে তা কেবল দো'আ ও মুনাজাতের দ্বারাই পেতাম। এটাই ছিল আমার ব্যথার মলম, আত্মার খোরাক এবং আমার আহত অন্তরের প্রলেপ। একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি যা তাঁকে সবসময় দো'আ ও মুনাজাতের ভেতর মশগুল রাখত, নিজেই অস্থির করত, এরপর নিজেই শান্ত করত। নিজেই দিলকে আহত করত, এরপর নিজেই তার ওপর মলম লাগাত। নিজেই কাঁদাত, আবার নিজেই চোখের অশ্রু মুছে দিত। দো'আরত অবস্থায়, কান্নাভারাক্রান্ত অবস্থায় কিছুটা বেশি সময় অতিবাহিত করতেন, এরপর সেই কান্না তিনি নিজেই নিজের ভেতর হজম করে নিতেন এবং ব্যথ্যাহত অন্তরকে, যা ছিল সবুজ ও শ্যামল, কিছুটা উত্যক্ত করে তুলতেন। অতঃপর যতক্ষণ না তিনি দিল্ খুলে দো'আ করতেন তাঁর অস্থির চিত্ত শান্ত হ'ত না, তৃপ্ত হ'ত না।

তাঁর সমস্ত দো'আ হ'ত আস্থা ভরা। আর আল্লাহ তা'আলার রহমতের ওপর তাঁর গর্বও ছিল অনেক। অনেক ভালভাল লোকের দো'আর ভেতর আমি সেই স্বাদ, এমন ইয়াকীন ও দৃঢ় প্রত্যয় দেখিনি যেমনটি আমি আমার মায়ের জীবনে দেখেছি। তাঁর জীবন ছিল সেই হাদীছের ওপর আমলের বাস্তব নমুনা যেখানে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের হাঁড়ির লবণ যদি কম হয়ে যায় তাহলে দো'আর মাধ্যমেই তা চেয়ে নাও, আর তোমার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তাও আল্লাহ্র কাছেই চাইবে।"

তাঁর গোটা জীবন দো'আ ও মুনাজাতের ভেতর কেটেছে। দো'আয়ে মা'ছূরা ও কাব্য মুনাজাত ছিল তাঁর আহার-বিহার, শয়ন-স্বপন ও নিদ্রা-জাগরণ, এমনকি সকল সমস্যা-সংকট ও দ্বিধা-দ্যোদুল্যমানতায় নিত্যসঙ্গী।

শৈশব থেকেই তিনি আমাদের ভাই-বোনদেরকে এতে অভ্যস্ত করেছিলেন। আমার মনে আছে, আমি যখন কিছুটা লেখাপড়া করার মত হয়েছি তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ

তুমি যখন কিছু লিখবে তখন 'বিসমিল্লাহ' লেখার পর সর্বপ্রথম এই কথাটা লিখবে ঃ

اللهم اتنی بفضلك افضل ماتوتی عبادك الصالحین

"হে আল্লাহ! তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাকে সেই সর্বোত্তম জিনিস দাও যা তুমি তোমার নেক বান্দাদের দিয়ে থাক।"

তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের এত সব দো'আ ও মাসনূন ওজীফা মুখস্ত ছিল যা এ যুগের মাদরাসা-মকতবের অনেক ভাল ভাল উস্তাদদেরও মুখস্থ নেই। তাঁর স্বরচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি বিলকুল তাঁর অবস্থা, তাঁর রুচি ও প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে ঃ

تیرا شیوہ کرم ہے اور میری عادت گدائی کی
نہ ٹوٹے آس اے مولا! تیرے درکے فقیروں کی

দান করাটা তোমার রীতি
আমার আদত হাত পাতার
আশা যেন ভঙ্গ না হয়
ফকীরের হে পরোয়ারদিগার!

তাঁর এই কবিতা তাঁর অস্থির অবস্থাকেই প্রকাশ করছে এবং আমি অধিকাংশ সময় এটা মুলতাযিম ও মাতাফে পাঠ করেছি। বিরাট স্বাদ ও উপকারিতাও পেয়েছি আমি এথেকে।

کونسی سرکار ہے جس کا ہے سب کو آسرا +
اورکونسا دربار ہے جس میں ہے ہرکوئی کھڑا
کونسا وہ شاہ ہے جس کا ہے ہرکوئی گدا
کو نسا در ہے نہ جس در سے کوئی خالی پھرا
آج اسی سرکار سے میں بھی تو پاکر شاد ہوں
اج اسی در بارسے میں بھی تو خوش ہوکر پھروں

কোন্ সে সত্তা যার কাছে সবার ঠাঁই
কোন্ সে দুয়ার যেখানে কারো বারণ নাই?
কোন্ সে বাদশাহ্ সকলেই যার ফকীর
কোন্ দরজায় খালি হাতে ফেরৎ নাই?

সেই শাহানশাহর দান পেয়ে আজ খুশী আমার
আঁচল ভরে কুড়িয়ে পাই ঘরে ফেরার।

দো'আর ভেতর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (মা'র) থেকে সেই সব বিষয় আদায় করিয়ে নিতেন যা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী আল্লাহওয়ালা আহলে দিল্ বুযুর্গদেরই বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি প্রথম থেকেই ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। এছাড়া মাসনূন দো'আসমূহ পাঠ ও সহজ-সরল অবস্থার বিবরণ সাধারণত তাহাজ্জুদ ও ফরয নামায অন্তে পেশ করতেন। অধিকাংশই কবিতাকারে তিনি আল্লাহ্র দরবারে তাঁর দাবি-দাওয়া পেশ করতেন এবং আপন মালিকের সামনে ফরিয়াদ তুলে ধরতেন।

এসব মুনাজাত ব্যথাভরা ও প্রভাবমণ্ডিত হ'ত এবং খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হ'ত, সকলের মুখে মুখে ফিরত। অতঃপর খান্দানের মহিলা ও শিশুরা সেগুলো মুখস্ত করে ফেলত এবং তারা তা পাঠ করত। যে সময় এসব মুনাজাত পাঠ করা হ'ত সে সময় এক অদ্ভুত পরিবেশ বিরাজ করত এবং অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। অনেক দিন আগে তাঁর এসব মুনাজাতের সংকলন "বাব-এ রহমত" পড়বার পর একজন সাহিবে দিল্ আরিফ বুযুর্গ বলেছিলেন, এ কবিতা যাঁর তাঁর মালিকের ওপর এক ধরনের গর্ব এবং তাঁর সঙ্গে বন্দেগীর এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে বোঝা যাচ্ছে। স্বয়ং আমার অবস্থা এই যে, মুনাজাতের এই সংকলনটি পড়ার সময় আমার এক বিশেষ ধরনের অবস্থা অনুভূত হয় এবং আমার তবীয়ত দো'আর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আমার মা স্বয়ং তাঁরই লিখিত এক গ্রন্থে সেই যুগের অবস্থার বিবরণ পেশ করেছেন যার থেকে অধিকতর সঠিক ও উত্তম প্রতিনিধিত্ব আর হতে পারে না।

"দো'আ ছিল আমার খোরাক। দো'আ ব্যতিরেকে আমার তৃপ্তি আসত না। দো'আর মধ্যে মশগুল হওয়া আমার এতটা বৃদ্ধি পায় যে, আমার সমস্ত কাজকর্ম আমার থেকে বিদায় নেয়। যদি কথাও বলতাম তবু দো'আ সহকারেই বলতাম। একটি মুহূর্তও দো'আ ব্যতিরেকে অতিবাহিত হ'ত না। জুমু'আর দিন ছিল আমার জন্য ঈদের ন্যায় আনন্দময় দিন। আসলেও ঈদের দিনই বটে। দিনভর দো'আ করতাম। বিশেষ করে আসর থেকে বেলা ডোবা পর্যন্ত একাকী বসে এমনভাবে দো'আর ভেতর ডুবে যেতাম যে, কোনদিকে চোখ তুলেও চাইতাম না। মোরগের প্রতিটি ডাকে এবং প্রতিটি আযানের মুহূর্তে আমি দো'আ করতাম। সাধ্যমতো দো'আর কোন একটি মুহূর্ত আমি নষ্ট করতাম না এবং কোন কথাও বাদ দিতাম না। প্রত্যেক ভয়ভীতি থেকে আল্লাহ্র দরবারে

নিরাপত্তা কামনা করতাম এবং সকল প্রকার ভাল চাইতাম। এ সবই সেই হাকীকী মালিকের অবদান ও কৃপা যে, যে ব্যাপারগুলো জীবনে চলার পথে সামনে এসে দেখা দিত সেগুলো সবই দো'আর সময় সামনে এসে যেত এবং এতটা জোশের সৃষ্টি করত যে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, সমস্ত জায়গা চোখের পানিতে ভিজে যেত এবং তাঁর অপার কুদরতের শান দৃষ্টে ছটফট করতাম যেভাবে যবাহকৃত মোরগ ডানা ঝাপটায়। কিন্তু এই আত্মহারা ও বেকারারী অবস্থায়ও আমার দো'আ অব্যাহত থাকত এবং সব সময় আমার চেহারার ওপর নজর বুলাতাম ও বলতাম ঃ

جو عیب قسمت کے ہیں مٹائے ترابی عالم میں نام ہوگا

"আমার কপালে যেসব দোষ-ঘাট রয়েছে তা মুছে দাও, এতে জগতে তোমারই নাম হবে।"

সিজদা থেকে মাথা কিছুতেই উঠাতাম না যতক্ষণ না আমার দিলে কিছুটা প্রশান্তি আসত। দো'আর পর আমি এতটা প্রশান্তি ফিরে পেতাম যে, মনে হত রহমতের দরজা খুলে গেছে এবং আমি সেই রহমতের ভাণ্ডার দো'হাতে লুটছি। কখনো কখনো আপন মনেই আমি হেসে উঠতাম এবং বলতাম ঃ

کیوں نہ آئے تجھکو حال پر میرے رحیم
بیکسوں کا بس توہی مونس توہی غمخوار ہے
تجھ سے کہکر کیوں نہ ہو بیتائی دل کم مری
کب نہیں ہوگی خبر تجھ کو دل بیتاب کی
آی پہونچے گی تیرے در بار میں جس دم مری
سائلوں میں اگ تیرے دربار کے میں بھی توہوں
کیوں رہے فریاد دل یوں درہم برہم مری
کیوں نہ میں چاہوں کہ خود ہی چاہنے والا ہے تو
کب گوارا ہے تجھے کہ چشم ہو پر نم میری

উদ্রেক হবে না কেন হে রাহীম তোমার দয়ার?
প্রতি পলে লভি আমি রহমতের পরশ তোমার।
অধমের ত্রাতা তুমি তুমি যে দরদী দয়াল
তোমাকে বলেও কেন উপশম হবে না ব্যথার?
আমার মনের ব্যথা কেন তুমি করবে না আঁচ
যখন দরবারে তোমার পৌছুবে আর্তের চীৎকার?
তোমার দুয়ারে মাগা আমিও তো ভিখেরী একজন

উপশম হবে না কেন এ দীনের মনের ব্যথার?
কেন আমি চাইব না তুমিই তো চাচ্ছ আমাকে?
আমার চোখের জল সইবে কি অন্তরে তোমার?

দো'আর প্রতি মোহ ও আসক্তি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেত এবং এর ভেতর আমার মা'র এক অত্যদ্ভূত স্বাদ, আনন্দ ও মিষ্টতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মত্তাবস্থা অনুভূত হত। এ সময় তাঁর ভারসাম্যময় তবীয়ত ও দিলের আকর্ষণ একে কাব্যের অবয়বও দান করে এবং তিনি তাঁর দিলের আবেগকে কাব্যে প্রকাশ করতে আপন মনকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে থাকেন। তিনি বলেন ঃ

"আমার কান্নাকাটি আমার মালিক-এ হাকীকীর নিকট এতই পসন্দনীয় যে, তিনি আমাকে যা কিছুই দেন কাঁদিয়েই দেন, কিন্তু সবার থেকে ভাল দেন, উত্তম বস্তু দান করেন। লাগাতার এক বছর এভাবেই চলল। এই অবস্থার সঙ্গে আমার এমনই আকর্ষণ সৃষ্টি হল যে, দো'আর চেয়ে বেশী প্রিয় আমার কাছে আর কিছু ছিল না। এর তুলনায় অন্য সব কিছুই তুচ্ছ মনে হত। দো'আতে আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, অধিকাংশ নামাযে সূরার পরিবর্তে আমি দো'আ চাইতে থাকতাম। আর কাজের কথা কী আর বলব? সেই মালিক-এ হাকীকী দু'আর সঙ্গে আমার এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, দো'আ ব্যতিরেকে আমার আরাম হ'ত না। নামায ও দো'আ থেকে মুক্ত হতেই আমি "হি'যবু'ল-আ'জম" পাঠ করতে শুরু করতাম এবং বারবার পড়তাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি দো'আ করা থেকে এতটুকু গাফিল থাকতাম না। মুখ দিয়ে যেমন আওড়াতাম, তেমনি লেখনীর সাহায্যও গ্রহণ করতাম, লিখতাম। এদিকে আমি এতটাই ঝুঁকে ছিলাম যে, নিজের থেকেই অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ ধরনের কবিতা সংশোধিত আকারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। অত্যন্ত কান্না-ভারাক্রান্ত অবস্থায় কবিতাটি পাঠ করতাম ও কাঁদতাম। মহাপ্রভুর অসীম শক্তি ও করুণার ওপর এতটাই ভরসা ছিল যে, ভাগ্যকে তুচ্ছ ভাবতাম এবং তাঁকে 'সাহিবে তদবীর' তথা কর্মনিয়ন্তা জেনে সর্বদাই গর্ব করতাম এবং সমস্ত বিপদ-আপদ ও ব্যথা-বেদনাকে সহজ মনে করতাম। সেইসব খাহেশ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করতাম যা আমার কিসমত থেকে দূরে ও দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্বের অপরিমেয় শানের দিকে তাকিয়ে বলতাম ঃ

ذرہ کو گرچاہے توہی پل میں کرے رشک قمر
تیری صفت یہ دیکھ کر کیوں حوصلۃ میرا ہوکم

তুমি যদি চাও তবে অনুপাত্র চাঁদের ঈর্ষার

আমি কেন এগুবো না জেনেশুনে এ গুণ তোমার?

"তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং তাঁর স্নেহ ও মায়ার ওপর আমার এতটাই অহংকার ছিল যে, আমি বলতাম, "হে পরম করুণাময় করুণানিধান! যদি তুমি আমার প্রয়াসে সফলতা দান না কর তাহলে আমি এমন চীৎকার দিয়ে উঠব যে, আসমান সেই চীৎকারে কেঁপে উঠবে, দুলে উঠবে পৃথিবী, আর আমি তোমার দুয়ার থেকে কখনো মাথাই তুলব না।"

نہ اٹھوں گی میں اس در سے کوئی مجھ کو اٹھا دیکھے
مجے ہے آرزو جس کی اٹھوں گی میں وہی لیکر

সে দ্বার থেকে উঠব না আমি
দেখুক না কেউ উঠিয়ে আমাকে
উঠব তখনই যখন আমার
অন্তরের সাধ যাবে পুরে।

"এ ছিল তাঁরই ভালবাসা, তাঁরই অবদান ও করুণা যে, এত বড় বিরাট শাহী দরবারে আমাকে অসম্ভব দুঃসাহসী করে তুলেছিল এবং আমি বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। কোনরূপ রাখঢাক ছাড়াই বলতাম এবং বলেই বেঁকে বসতাম আমার কথায়। আর এত বড় বাদশাহ মহারাজাধিরাজ হয়েও আমার মত নগণ্য ভিখারীর দাবি মেটাতেন তিনি।"

یہ شان دیکھی تیری نرالی جو مانگے تجھ سے تو اس سے راضی
بلاکے دنیا کرم ہے تیرا یہ فضل بھی ہے کمال بھی ہے

তোমার এ শান আজব আল্লাহ
যেই মাগে তাকে দিতে রাজী
একটুও তাতে মন করো না ভার
চাকচিক্যময় এ দুনিয়া
তোমারই দান
ফযল তোমার-কৃতিত্ব অপার।

বিয়ে

আমার মা বিয়ের বয়সে উপনীত হলেন এবং তাঁর সমবয়সী কয়েকজন বোন ও আত্মীয়ার ইতোমধ্যে বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর অর্থাৎ আমার আম্মার বিয়ে সম্পর্কে তাঁর বাপ-মা (আমার নানা-নানী) তখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। বিয়ের সম্বন্ধ ঘরেই ছিল। আপন কনিষ্ঠ চাচাতো ভাইয়ের

সঙ্গে তাঁর বড় বোনের বিয়ে হয়। বড় বোন এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যৌবনেই ইনতিকাল করেন। অতঃপর ছোটজনের (অর্থাৎ আমার আম্মা) জন্য বিয়ের পয়গাম পাঠানো হয়। চাচাজানের ঘরে সর্বপ্রকার পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, পর্যাপ্ত সহায়-সম্পত্তি ও জাগতিক প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু কোন প্রকার বিশেষ ধর্মীয় রুচিপ্রবণতা ও উন্নত ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না। বিয়ে হবার মত সঙ্গত সকল প্রকার কার্যকারণ ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া দূরেও কোথাও নয়, বরং এ সম্বন্ধ নিজের বাড়িতে। সহায়-সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয় ছিল উভয় পরিবারের মিলিত। একই ঘরে বসবাস। আমার নানীজান এ সম্বন্ধের বেলায় ছিলেন অতি উৎসাহী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। ইতোমধ্যেই একটি অদৃশ্য বিষয় প্রকাশিত হয়ে যেন সব কিছু ওলট-পালট করে দিল।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হায়্যি রহমাতুল্লাহি আলায়হে-র প্রথম বিয়ে ১৩০৯ হিজরীতে তাঁরই আপন মামাতো বোনের সঙ্গে ফতেহপুর জেলার হাঁসোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও মমতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৩১৯ হিজরীতে লাখনৌয়ে আমার সেই মা আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। স্মৃতি হিসেবে রেখে যান আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলভী হাকীম সাইয়েদ আবদুল আলীকে, যাঁর বয়স ছিল সে সময় ৯ বছর। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার আব্বার ওপর এতটাই প্রভাব ফেলে যে, তিনি সে সময় তেত্রিশ বছরের একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও আর বিয়ে করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। আমার দাদা মওলভী হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন (র) এবং আমার নানা সাইয়েদ শাহ যিয়াউন নবী (র) উভয়ে হযরত মাওলানা খাজা আহমদ নাসীরাবাদীর খলীফা এবং আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াও পরস্পর পীরভাই ছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় ছিল। এই দুর্ঘটনার পর তাঁর মনে তীব্র হয়ে এই আকাংক্ষা দেখা দেয় যে, আমার আব্বার দ্বিতীয় বিয়ে হযরত শাহ যিয়াউন নবী সাহেবের মেয়ের সঙ্গে সম্পন্ন হোক যিনি (আমার মা) সে সময় বিয়ের সর্বাংশে উপযুক্ত ছিলেন এবং যিনি দীনদারী, আচার-আচরণ, ব্যবহারিক রীতিনীতি ও লেখাপড়ার প্রতি বাড়তি প্রবণতার জন্য আমার দাদার নিকট অত্যন্ত আদরণীয়া ছিলেন।

কিন্তু আমার আব্বা বিয়ের প্রতি আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। সৌভাগ্যের হাতছানি সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও নিশ্চুপ ছিলেন। আমার আব্বার একজন ঘনিষ্ঠ ও একান্ত সুহৃদ মুনশী আবদুল গনী মরহুম আমাকে একবার নিম্নের ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, একবার তিনি রায়বেরেলী যান। হাকীম সাহেবের

আব্বা মওলানা ফখরুদ্দীন তাকে অত্যন্ত দরদভরে বলেন, আমার দেউড়ী কী এখন প্রদীপবিহীন থাকবে? সাইয়েদ (পরিবারে তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন) বিয়ে করতে চায় না। আমার বিদায়ের পর এ ঘরে আলো জ্বালাবার কেউ থাকবে না। তুমি সাইয়েদকে রাজী করাও। এরপর আমি লাখনৌ এসে মওলভী (সাইয়েদ আবদুল হায়্যি) সাহেবকে বললাম, আপনার শ্রদ্ধেয় আব্বার খুবই ইচ্ছা ও আগ্রহ যেন আপনি বিয়ে করেন। আপনি যদি অস্বীকার করেন তাহলে আমার ভয় হয় না জানি তিনি অসন্তুষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালনে সম্মত হন। ফলে নানার বাড়িতে বিয়ের পয়গাম পাঠানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের খান্দানে আমার নানার বাড়ি যেমন খানাপিনা, প্রাচুর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে বিশিষ্ট ছিল, অপরদিকে আমার দাদার এখানে এসবের তেমনি কমতি ছিল। দীর্ঘকাল থেকে এখানে না ছিল জমিদারী আর না ছিল সহায়-সম্পত্তি। খান্দানের এই শাখার বহু ওপর থেকেই ইলমে দীনের ধারাবাহিকতা চলে আসছিল এবং মওলভী পরিবার নামে সর্বত্র মশহুর ছিল। এই পরিবারে সহায়-সম্পদ বলতে ছিল স্তূপীকৃত কিতাবের ভাণ্ডার ও দীনী ইল্‌ম পুরুষানুক্রমে যা চলে আসছিল আর এটাই ছিল সবচে' বড় সম্পদ। সে সময় বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে এক ধরনের অভাব-অনটন ও অস্বচ্ছল অবস্থা বিরাজ করছিল। আমাদের দাদা ছিলেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, বিদগ্ধ মনীষী ও লেখক, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে ছিলেন নিস্পৃহ, উদাসীন ও অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। জীবন-জীবিকার প্রতি কোন দিনই তেমন মনোযোগ দেননি। বাড়িতে কোন কোন সময় অনাহারে উপবাসে থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

আব্বা দারু'ল-উলূম নদওয়াতুল উলামার নাজেম হিসাবে প্রথম দিকে ৩০-৪০ টাকার মত বেতন পেতেন। কিন্তু পরে এ টাকা গ্রহণ করাও ছেড়ে দেন। এমতাবস্থায় যখন বিয়ের পয়গাম আমার নানার বাড়ি গিয়ে পৌঁছুল আমার নানী সাহেবার পক্ষে এ পয়গাম কবুল করা তখন বেশ দুষ্কর হয়েই দেখা দিল। তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কেননা মেয়েরা সাধারণত এসব ব্যাপারে অত্যন্ত দূরদর্শী ও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে। উভয় পরিবারের বাড়ি ছিল পরস্পর সংলগ্ন। তিনি এ বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। প্রথম সম্বন্ধের মোকাবেলায় এই সম্বন্ধকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাঁর উপলব্ধিতে আসেনি। জেনেশুনে নিজের মেয়েকে কষ্টের মাঝে নিক্ষেপ করা তাঁর নিকট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল না।

কিন্তু আমার দাদার সাথে নানার সম্পর্ক ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ। আমার আব্বা তাঁর থেকে রূহানী উপকারও লাভ করেছিলেন এবং তিনি অর্থাৎ আমার নানা আমার আব্বার বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পয়গাম পেতেই তিনি নেচে উঠলেন যেন তিনি এতদিন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। নানী সাহেবাকে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, সাইয়েদ বয়সে যুবক, নেককার, আলেম ও তাঁর ভবিষ্যত অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তাঁর মোকাবেলায় আমি আর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আমার কাছে দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার কোন গুরুত্ব নেই। আসলে যা দেখার তা হল যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি।

এখন এ সম্পর্কে আমার মা'র ভাষ্য তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক। তিনি তাঁর "আদ-দু'আ ওয়া'ল-কদর" নামক পুস্তিকায় বলেন ঃ

"যেদিকে আকর্ষণ বেশী ছিল তা ছিল আমার চাচার ঘর। আমার দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল সে বাড়িতেই। বহুকাল থেকেই এ বাড়ি স্বচ্ছল ও প্রাচুর্যে ভরা। পার্থিব দিক দিয়ে বলা যায় তুলনাহীন। কি ধন-সম্পদে, কি ইজ্জত-সম্মানে, কি লজ্জা-শালীনতায়, কি আচার-ব্যবহারে- মোটের ওপর এর চেয়ে ভাল ঘর ও ভাল সম্বন্ধ আর ছিল না। আমার মরহুমা আম্মার আন্তরিক আকাংক্ষা ও আগ্রহ সেদিকেই ছিল। আপন ভাই-এর ঘরের চাইতেও এ ঘরকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। আর আমারও সে ঘর প্রিয় ছিল। সব কিছুই আমার অনুকূলে ছিল। কিন্তু আমার মরহুম আব্বার খেয়াল ছিল, দরিদ্র হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া চাই। এই গুণটির এখানে অভাব ছিল।"

এই রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও টানা-পোড়েনের ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকালে আমার আম্মা, যাঁর সে সময় স্বপ্নের সঙ্গে বিরাট সম্বন্ধ ছিল, এমন কয়েকটি স্বপ্ন দেখেন যার ভেতর আব্বার বাড়ির দিকে ইঙ্গিত ছিল এবং এও বলছিল যে, যদি এই দুই বাড়ির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। এরই আগে পিছে তিনি অত্যন্ত সুসংবাদমূলক একটি স্বপ্ন দেখেন যদ্দ্বারা তিনি সারা জীবন সান্ত্বনা লাভ করেছেন। যখন তিনি এর আলোচনা করতেন তখন তাঁর ওপর এক বিশেষ কাইফিয়ত দেখা দিত। তিনি বলেন ঃ

"এক রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, খাস সেই দয়ালু মালিক, যিনি রহমান ও রহীমও বটেন-এর বদান্যতায় ও মেহেরবানীতে একটি আয়াতে কারীমা লাভ করেছি সকাল অবধি আমার মুখে তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু সেই সাথে এমন কিছু ভয় ছিল যা আমি বলতে পারিনি। মুখ দিয়ে বের করা কঠিন ছিল আর এর অর্থও আমার জানা ছিল না। অতঃপর আয়াতের অর্থ নিয়ে যখন চিন্তা করলাম

তখন খুশীতে আমি ফুলে উঠলাম এবং সকল রকম দুশ্চিন্তা ভুলে গেলাম। আমি আমার এই ভাগ্যে গর্বিত হলাম এবং এই স্বপ্ন বললাম। যেই শুনল সেই ঈর্ষা করল। আমার আব্বা তো আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। আয়াতটি ছিল এই :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ" (সূরা আস-সাজদা, ১৭ আয়াত)।

শেষ পর্যন্ত নানার সিদ্ধান্ত ও অভিলাষই জয়ী হল এবং ১৩২২ হিজরী (১৯০৪ খৃ.)-তে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে এই বিয়ে সম্পন্ন হল। এই বিয়ে হওয়ায় আমার দাদা আনন্দে বাগবাগ হয়ে যান এবং তাঁর নির্বাচনে তিনি তৃপ্ত ও খুশী ছিলেন। মা ঘরে আসতেই তিনি বাড়িঘরের যাবতীয় এন্তেজাম এবং আব্বার দুই ছোট বোনের– যারা অন্য মায়ের গর্ভজাত ছিলেন, মায়ের হাতে তুলে দেন এবং নিজে ও দাদী সাহেবা বাড়িঘর ও বালবাচ্চার যাবতীয় ঝামেলা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে যান।

কল্যাণ ও বরকত নেমে এল

মা তাঁর নিজের নতুন ঘরে এসে সেই চিত্রই দেখতে পেলেন যার কথা তিনি প্রায়শ শুনতেন : টানাপোড়েনের সংসার, কখনো স্বচ্ছলতা, আবার কখনো অর্ধাহার ও অনাহার। ঘরে কয়েকজন খানেওয়ালা পোষ্য, অথচ দাদার দৈনিক আয়-আমদানী নামেমাত্র। এদিকে আমার নানী সাহেবা তাঁর স্নেহের টানে সব সময় এই আশংকায় কাটাতেন যে, তাঁর মেয়ের কোন কষ্ট হচ্ছে না তো! কখনো-বা আমার কোন মামাকে আমাদের বাড়িতে পাঠাতেন দেখে আসতে যে, আমাদের বাড়িতে রান্নাবান্না হচ্ছে কি না। আম্মা কয়েকবার আমাদেরকে বলেছেন, যখনই আমি কাউকে বাপের বাড়ি থেকে এদিকে আসতে দেখতাম অমনি চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে দিতাম ও জ্বাল দিতে থাকতাম যাতে ধারণা হয় যে, রান্না চলছে। অথচ হাঁড়িতে তখন পানি ছাড়া আর কিছু থাকত না। কোন কোন সময় নানী সাহেবা তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝে ফেলতেন এবং ঘর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

কিছুদিন পর আব্বা হেকিমী শুরু করতে মনস্থ করলেন। আম্মা বলেন, তিনি এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাইলে আমি জোর সমর্থন করি। ফলে হেকিমী শুরু হয় এবং শুরু হতেই সকল পেরেশানী দূর হয়ে যায়। অর্থ সমাগম ঘটতে থাকে এবং খুব সত্বর এত বরকত দেখা দেয় ও উন্নতি হতে থাকে যে, ঘরের চেহারাই পাল্টে যায়। বাড়িঘরের বিরাট অংশই ছিল ভাঙাচোরা। আম্মার বুলন্দ হিম্মতির

দরুন এর সংস্কার ও নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা পাকাপোক্ত হাবেলীতে পরিণত হয়। দুই বোন ও ভাইজান[১]কে আম্মা এভাবে কাছে টেনে নেন যে, তারা তাদের মরহুম আম্মার কথাই ভুলে গেলেন এবং সারা জীবন আম্মাকেই নিজেদের মা জেনেছেন। যে বাড়ির নিজের লোকদেরকেই এক সময় অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়েছে এখন সেখানে সকল বাড়ির তুলনায় বেশী মেহমানের আগমন শুরু হয়। রায়বেরেলী ও লাখনৌর পার্শ্ববর্তী এলাকার আপন-পর সব ধরনের লোকের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়।

নিজের বাড়ির এই ছবি ও এর বৈশিষ্ট্য এবং অতি অল্পদিনেই এখানে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সে সবের উল্লেখ আম্মা তাঁর নিজের লেখাতেই করেছেন এবং তা তাঁর মুখেই শোনাবে ভাল। এর দ্বারা তাঁর প্রকৃত আবেগ-উৎসাহ ও রুচি-প্রকৃতি পরিমাপ করা যাবে।

"এ বাড়িতে সম্পদের প্রাচুর্য ছিল না ঠিক, কিন্তু এমন কিছু সম্পদ ছিল যার মোকাবেলায় সকল বৈষয়িক ও বস্তুগত সম্পদ কুরবানী করা যায়। 'ইল্‌ম তথা জ্ঞান এমনই এক সম্পদ যা লাভ করার জন্য সকল সম্পদ নিঃশেষ করলেও তা কম হবে। এছাড়া 'ইল্‌ম-এর সঙ্গে সঙ্গে আরও হাজারও সম্পদ ছিল। সম্পদ এমন এক জিনিস যা হাজার রকমের ঝগড়া-বিবাদ ডেকে নিয়ে আসে। আল্লাহ পাক ধনীদের চেয়ে আমাকে অনেক বেশী সম্মান দিয়েছেন এবং এমন সব অনুগ্রহ ও করুণারাশি আমার ওপর বর্ষণ করেছেন যা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এত স্বল্প আয়-উপার্জনের ভেতর দিয়েও এমন অনেক কাজ করিয়েছেন যা অনেক ধনীরাও করতে পারে না। এমন সব প্রয়োজন পূরণ করিয়েছেন যেগুলো পূরণের জন্য অনেক সময়ের দরকার হয়। বাড়িঘরের অর্ধেক পরিমাণ অনেক দিন থেকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। এছাড়া বিয়ে-শাদী ইত্যাদির কোন সূরত ছিল না। অপ্রয়োজনীয় রসম-রেওয়াজও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মামূলীভাবে দিন কাটছিল।

"এখানে আমি আমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছি না, বরং আমার প্রকৃত মালিকের অপার কুদরত এবং দো'আর আজমত ও বরকত দেখাচ্ছি যে, কিছু দিনের মধ্যেই এই বাড়ি ঈর্ষাযোগ্য বাড়িতে পরিণত হয়। এ বাড়ি আগের সেই বাড়ি ছিল না আর আগেকার সেই অভাব-অনটনও ছিল না। প্রয়োজনীয় সব কিছুই অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ও সুন্দরভাবে পূরণ হয়ে চলেছিল। বাড়ির অর্ধেক নয়, বরং গোটা অংশ জুড়েই বেশ ভাল রকম এক শানদার ইমারত নির্মিত হয়ে যায়।

---

১. ডা. সাইয়েদ আবদুল আলী।

যে ঘরে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আর কিছু ছিল না সেই ঘর আমার মেহেরবান মালিক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতিসহ সব ধরনের প্রাচুর্য দিয়েই ভরে দিয়েছেন। এখানে পেরেশানির কিছু ছিল না। সেই মেহেরবান মালিকের রহমত ও বরকতের অব্যাহত ধারা এমনভাবে আমার ওপর নাযিল হল মনে হয় যেন রহমতের দরজা খুলে গেছে। বাড়ি তো নয় যেন সাক্ষাত বেহেশ্‌তে পরিণত হ'ল। সমস্ত আশা-আকাংক্ষা যা এতদিনে সংকীর্ণ কুঠরিতে ঠাঁই নিয়েছিল, তা ব্যাপক ও বিস্তৃত অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোই ছিল দুষ্কর, আর এখন আল্লাহ্‌র ফযলে অন্যের প্রয়োজন আমাদের দ্বারা পূরণ হতে লাগল। এককালে তো গোটা মাসও তৃপ্তির সাথে, স্বস্তির সাথে অতিবাহিত হ'ত না। আর এখন বছরের পর বছর এমন একদিন যায় না যখন বাড়ি মেহমানশূন্য থাকে। সেই মেহেরবান মালিকের বদান্যতায় সবরকমের প্রাচুর্য বিদ্যমান, আরাম-আয়েশ বর্তমান। চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যা-সংকটের দোলায় আর দোলায়িত নই আমরা।"

তিনি আরও বলেন ঃ "এই বাড়ি আমার জন্য ছিল জান্নাত সদৃশ আর এই খেদমত ছিল রহমত সদৃশ। আমি যেন রহমতের ছায়াতলে এসে গেছি, না আছে চিন্তা আর না আছে পেরেশানী, প্রতিটি মুহূর্ত আমার শোকরগুযারীর ভেতর অতিবাহিত হতে থাকে।"

کس زبان سے کروں میں شکرادا + تیرے انعام ولطف بے حد کا
تونے مجھ کو کیابنی آدم + اشرف الخلق اکرم العالم

তোমার শোকর আমি কী করে করব আদায়
তোমার অপার দানে ডুবে আছে সত্তা যে আমার
আদমকুলে জন্ম দিয়েছ তুমিই আমাকে
সৃষ্টির সেরা আর সর্বসেরা করলে সংসারে?

সবর ও শোকরগুযারীর যিন্দেগী ও আমলের পাবন্দী

হি. ১৩২৬ (১৯০৮ খৃ.) ছিল আমাদের পরিবারের জন্য, বরং খান্দানের জন্য শোকের বছর, বিষাদের বছর। এই এক বছরের মধ্যেই দুই মাসের ব্যবধানে আমার দাদা ও নানা উভয়ে ইনতিকাল করেন। আর এতে আমার আব্বা ও আম্মা উভয়ে একইরূপ শোক ও আঘাতের সম্মুখীন হন এবং উভয়ে একে অপরের শোক-দুঃখের সহমর্মী হন। আলহামদু লিল্লাহ! উভয়ে এই আত্মীয়তা সম্পর্কের সাফল্য ও কামিয়াবী এবং আমাদের ঘরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখে

দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

এরপর আমার আম্মা বেশীর ভাগ সময় লাখনৌয়ে অবস্থান করতে থাকেন। পরিবারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ও যিম্মাদারী তাঁরই ঘাড়ে ন্যস্ত ছিল। মেহমানের সমাগম ছিল ব্যাপক। খান্দানের কয়েকটি বালক ও শিশু লেখাপড়া উপলক্ষ্যে স্থায়ীভাবে আমাদের বাড়িতেই থাকত। ভাই সাহেব লেখাপড়ার ভেতর ছিলেন। বিভিন্ন মেহমান, বিশেষ করে আত্মীয়-কুটুম্বের খাতির-যত্ন এবং তাদের মর্যাদা ও মেযাজের প্রতি খেয়াল রেখে তাদের হক আদায় ও সামাল দেয়া ছিল এক নাযুক ও কঠিন দায়িত্ব। আম্মার জীবন এ সময় আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের এক জীবন্ত নমুনা ছিল যা উপমহাদেশীয় মহিলাদের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য এবং দীনদার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের প্রতীক চিহ্ন। তিনি (আম্মা) আব্বার অনুমতি ব্যতিরেকে, যদিও তিনি আম্মাকে বাড়ির যাবতীয় দায়দায়িত্বের ভার দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর অর্থাৎ আব্বার কোন জিনিস ব্যবহার করা প্রায় নাজায়েয মনে করতেন। বাড়িতে যেসব মৌসুমী ফল ছিল এবং বাইরে থেকে যেসব উপহার-উপঢৌকন আসত– আব্বা অনুমিত না দেওয়া এবং কাকে কি দিতে হবে স্পষ্ট ভাষায় ও পরিষ্কার করে না বলা পর্যন্ত তিনি তাঁর ভাই-ভাতিজা ও ভাগ্নেদের তো দূরের কথা– নিজের সন্তানের হাতে দেওয়াকেও গোনাহ মনে করতেন।

আমার আব্বার সম্পর্ক খুব বেশী বিস্তৃত ছিল না। তাঁর সম্পর্ক ছিল হাতে গোনা কিছু লোকের সঙ্গে। এদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন যাঁরা তাঁর পীর হযরত মাওলানা ফযলে রহমান সাহেব গঞ্জে মুরাদাবাদী (র)-র সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের দরুন ভূপালের নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াব সাইয়েদ নূরুল হাসান খান মরহূমের সঙ্গে খুবই গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আব্বার সঙ্গে তাঁর এমন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, তাঁকে ব্যতিরেকে তিনি স্বস্তি পেতেন না। এই বিশেষ সম্পর্কের দরুন আম্মা এবং বাড়ির সকলকে তাঁদের বাড়িতে বারবার যেতে হত। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান থাকুক আর নাই থাকুক এমন কোন মাস যেত না যেই মাসে বেগম সাহেবা কোন না কোন বাহানায় আম্মাকে ডেকে না পাঠাতেন। আর একবার গেলে সারাদিন থাকতে হ'ত। কিন্তু এত খোলামেলা সম্পর্ক সত্ত্বেও আম্মার নিজের আচার-আচরণ ও চালচলন তেমনি রেখেছিলেন যেমনটি তাঁর পরিবারে চলে আসছিল। তাঁর সাদাসিধা জীবন, নির্জনপ্রিয়তা, অল্পে তুষ্টি এবং দুনিয়ার প্রতি নিস্পৃহ মানসিকতা ও নিরাসক্তির ভেতর এতটুকু পার্থক্য দেখা দেয়নি।

নওয়াব সাহেব মরহূম ছাড়াও আব্বার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যেখানে তাঁর যাতায়াত ছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন দীনদার, আল্লাহওয়ালা ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁদের সকলেরই মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী কিংবা মাওলানা মুহাম্মাদ নঈম ফিরিঙ্গী মহল্লীর মধ্যে কারুর না কারুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল যিনি আব্বার প্রিয়তম উস্তাদ ছিলেন অথবা তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ বিশেষ 'ইলমী বা দীনী সম্পর্ক ছিল। একজন ছিলেন মুনশী মুহাম্মাদ খলীল সাহেব, দ্বিতীয়জন মুনশী রহমত উল্লাহ সাহেব, তৃতীয়জন হাজী শাহ মুহাম্মাদ খান এবং চতুর্থজন শেখ মুহাম্মাদ আরব যিনি আব্বার উস্তাদ ও উস্তাদ-পুত্র ছিলেন। অধিকাংশ অনুষ্ঠান ও দাওয়াতে আম্মা এই কয়েকটি বাড়িতেই আসা-যাওয়া করতেন।

এই গোটা সময়পর্বে, যার মধ্যে জীবন-যিন্দেগী ও পরিবারের বহুবিধ উত্থান-পতন ঘটে। কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়। আনন্দ ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর নিয়মিত আমলসমূহ, দো'আর প্রতি আকর্ষণ ও নিবিষ্টচিত্ততা এবং কুরআন মজীদের দওর আগাগোড়াই অব্যাহত ছিল। রমাযানুল মুবারকে কুরআন মজীদের দওর এবং কোন কোন সময় তারাবীহ নামাযে কুরআন খতমের ধারাও অব্যাহত ছিল। ভাই সাহেব তখনও আম্মাকে ভালবাসতেন যখন তাঁর নিজের মা বেঁচে ছিলেন। পরবর্তী কালে নিজের মা ও আমার আম্মার মাঝে পার্থক্য ভুলে গিয়েছিলেন এবং আমার আম্মাও ভাইয়াকে নিজের সন্তানের ওপর হামেশাই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমার আব্বার দুই বোন এবং ভাইয়ার বিয়েও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সর্বপ্রযত্নে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

মর্মান্তিক শোক ও ধৈর্য ধারণ

মোটের ওপর এই সময়টা সর্বপ্রকার আনন্দ ও হাসিখুশী এবং কল্যাণ ও প্রাণ-প্রাচুর্যের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হচ্ছিল। ঠিক তখন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ১৩১৪ হিজরীর ১৫ই জুমাদা'ল-উখ্‌রা (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) তারিখে আব্বা ইনতিকাল করেন। প্রথম থেকেই আব্বার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। আমার চাচা সাইয়েদ আযীযুর রহমান কিছুটা ব্যথা পেয়েছিলেন। আব্বা আমার আম্মাকে রোগী দেখতে চাচার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। মাগরিবের পর পর্যন্ত কাজ করেন। লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করেন। নদওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই-স্বাক্ষর করেন। অতঃপর অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এবং পরম স্রষ্টার প্রিয় সান্নিধ্যে গিয়ে উপনীত হন।

আমার বেশ মনে আছে, আমার বয়স তখন নয় বছর। আমিই আমার আম্মাকে আনতে গিয়েছিলাম। তিনি যখন এলেন এবং সমস্ত ব্যাপার জানলেন অমনি সেজদায় পড়ে গেলেন। যা হবার ছিল তাই হয়েছে। এই মর্মান্তিক শোক তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং অবনত মস্তকে তা মেনে নিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন ঃ

"খেদমতের মুদ্দত যখন শেষ হবার উপক্রম হল তখন আমার পরম প্রিয় প্রভু আমার অনুকূলে কল্যাণকর ভেবে ভাগ্যের বাহানা পেশ করলেন। আল্লাহ্‌র হুকুম পেতেই ভাগ্য তাৎক্ষণিকভাবেই তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল। আমিও আমার পরম প্রভুর এই ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলাম। এই বিয়োগ ও বিচ্ছেদ ব্যথা এমন ছিল না যা সহজে সহ্য করা যায়। এটাও তাঁর দয়া ও অপার হেকমত যা তাঁর সন্তুষ্টির ওপর আমাকে অবনতমস্তক রেখেছে। অন্যথায় অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটা বিচিত্র ছিল না। অন্যথায় এমনতরো প্রিয়তম জীবন-সঙ্গীর আকস্মিক অন্তর্ধান আমার জন্য মহাপ্রলয়ের চেয়ে কম ছিল না। আমি বলতে পারি না যে, আমার ধড়ে প্রাণ কি করে টিকল। ব্যস! এতটুকুই বলতে পারি যে, এই নির্দেশ আমার জন্য ধ্বংস ও মুসীবতের ছিল না, বরং আগাগোড়াই রহমত ও করুণা সিন্ধুর মাধ্যম ছিল যে, তিনি ধ্বংসের পরিবর্তে আমাকে তাঁর করুণা ছায়ায় নিয়ে নিলেন এবং আমার সত্যিকার শুভাকাংখী, শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারী ও মদদগার হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তের সাথী ছিলেন।

"সুবহানাল্লাহ! তাঁর রহমতের কি শান দেখুন। তাঁর উত্থিত শোকের ঘনঘটা করুণার মেঘমালা হয়ে বর্ষিত হল যদ্দ্বারা সমস্ত বিরান ক্ষেত-খামার সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল।"

সে সময় লাখনৌর বাড়িতে পুরুষ বলতে কেবল আমিই ছিলাম। তাও আমার বয়স নয়-দশ বছর মাত্র। ভাইয়া লাখনৌ মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে (তিনি মেডিকেলের ছাত্র ছিলেন) ছাত্রদের একটি দলের সঙ্গে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। সেখানে মেডিকেলের এমন একটি শাখা ছিল যেমনটি তখন লাখনৌয়ে ছিল না। বড়দের মধ্যে আমার আব্বার ফুফাতো ভাই মৌলভী সাইয়েদ আযীযুর রহমান নদভী লাখনৌয়ে ছিলেন বটে তবে অসুস্থ ছিলেন।

পরদিন ১৫ই জুমাদাল-উখ্‌রা, ১৩৪১ হি. (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩) আমাদের ছোট্ট শোকাহত কাফেলা রায়বেরেলী অভিমুখে রওয়ানা হল যেখানে আব্বাকে তাঁর পরিবারের বুযুর্গদের কবরের পাশেই দাফন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। লাখনৌ থেকে বাহ্যত আমরা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন

হচ্ছিলাম। আব্বার ছায়া মাথার ওপর থেকে উঠে গিয়েছিল। ভাই ছিলেন প্রবাসে। আব্বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি যা রেখে গিয়েছিলেন তা নগদে কেবল এক টাকা যা তাঁর ঔষুধের বাক্সের তলায় কোথাও পড়ে ছিল এবং বছরের পরও সেভাবেই পড়ে ছিল। ধার হিসেবে কিছু ফিস অটোয়ার এক রাজার যিম্মায় ছিল। প্রথম থেকেই আমাদের পরিবারের না কোন স্থাবর সম্পত্তি ছিল আর না ছিল জায়গীর কিংবা জমিদারী। দৈনিক যা আয় হত তাই ছিল রোজকার ব্যয়। হিসেব-কিতাব করা কিংবা কত এল আর কত গেল- এর হিসেব রাখা ছিল আব্বার ধাতের বাইরে। ভাইজানের পড়াশোনা তখনও শেষ হয়নি, শেষ হতে তখনো দু'বছর বাকী। আমার মনে নেই যে, প্রথম দিককার দিনগুলো কিভাবে কেটেছিল। তবে হ্যাঁ, আমাদের মামুজান ছিলেন আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহশীল এবং আমার আম্মার জন্য ছিলেন উৎসর্গীতপ্রাণ। সে যাই হোক, আমার আম্মা তাঁর প্রকৃতিগত সাহস ও অটুট মনোবলের মাধ্যমে সবকিছুর মোকাবেলা করেন এবং তিনি আমাদেরকে বুঝতে দেননি যে, আমরা এতিম হয়ে গেছি, আমাদের অবস্থা আর আগের মত নেই।

সম্ভবত সপ্তাহ কিংবা দিন দশেক পর ভাইজান (যিনি এই দুর্ঘটনার খবর বোম্বাই থাকাকালে এক অত্যাশ্চর্য পন্থায় পেয়েছিলেন) আকস্মিকভাবে রায়বেরেলীতে এসে পৌঁছেন। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আব্বার কবরে গিয়ে তাঁর অস্থির কান্নার সেই দৃশ্য আমি এখনও দেখতে পাই। মনে হয় যেন গত কালের ঘটনা। এরপর তিনি ঘরে ফিরলেন। আম্মা ও বোনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করলেন। তাঁর রূহের ওপর আল্লাহ পাকের সহস্র প্রকারের করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। এরপর আর কোন দিন তিনি আমাদেরকে অনুভব করতে দেননি যে, আমরা আব্বার ছায়া থেকে মাহরূম হয়ে গেছি, তাঁর স্নেহছায়া আমাদের মাথার ওপর থেকে চিরতরে উঠে গেছে। সেই দিন থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি বাপের মতই স্নেহ, অনুগত সন্তানের মত খেদমত এবং গর্বিত ভাইয়ের ভালবাসা দিয়েছেন। আম্মা ও আমাদের সব ভাইবোনের সঙ্গেই তাঁর সৌভাগ্য ও প্রীতি আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। সে এক লম্বা কাহিনী যা শোনাবার জায়গা এটা নয়। ভাইজানের আলোচনা ও সেই ইতিহাস শোনাবার সময় ও সুযোগ আল্লাহ পাক যদি আমাকে কখনো দেন তবে তা শোনানো হবে।[১]

---

১. আলহামদু লিল্লাহ! 'হায়াতে আবদুল হাই' নামক আমার আব্বার জীবনী গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমি আমার ভাইজানের আলোচনা করেছি। ১৯৭০ সালে বইটি দিল্লীর নদওয়াতু'ল-মুসান্নিফীন নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আম্মার জীবনের পেশা ও নেশা

রায়বেরেলীতে ইদ্দত পালনকালে এবং এর পরেও আমার আম্মার পেশা ও নেশা ছিল দু'টো। এক. ধর্মীয় বই-পুস্তক ও কিতাবাদি পড়িয়ে শোনা যা পড়ে শোনাবার সৌভাগ্য অধিকাংশ সময় আমার ভাগ্যেই জুটত। দুই. দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগী যা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী নেশা।

সেকালে আমাদের খান্দানে একটা বেশ ভাল নিয়ম ছিল যে, যেখানেই এ ধরনের কোন শোকাবহ ঘটনা ঘটত, অন্তর-মানস দুঃখ-ভারাক্রান্ত হত কিংবা কোন পেরেশানীর বিষয় দেখা দিত তখন "সামসামু'ল-ইসলাম" শোনা হ'ত। এটি ছিল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়াকেদী লিখিত "ফুতূহু'শ-শাম" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের পঁচিশ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট কাব্য অনুবাদ। কাব্যানুবাদটি করেন আমাদেরই খান্দানের একজন বুযুর্গ আমার আব্বার ফুফা মুনশী সাইয়েদ আবদুর রাযযাক কালামী। আবেগ উদ্দীপক ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ, দরদ ও প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় লেখক যুদ্ধের এমনসব ছবি এঁকেছেন যে, অন্তর-মন জোশে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনায় শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে ওঠে, রক্ত সঞ্চালনের গতি বেড়ে যায়। শাহাদাতের বর্ণনা এমনভাবে বিবৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করার জন্য মন অস্থির হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে অধীর এবং সাহাবায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনে ইসলামের বিষাদের সামনে নিজেদের দুঃখ-বিষাদ ভুলে যেতে হয়। সান্ত্বনা ও সমবেদনা এবং বাড়িতে ধৈর্য-স্থৈর্য ও প্রশান্তি এবং আল্লাহ্‌র বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নেবার পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যই এইসব প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই মনের প্রশান্তি ফিরে আসে।

লেখা ঃ নেশা ও পেশা হিসেবে

আম্মা মুনাজাত ও কবিতা লিখে নিজের শোক-দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করতেন এবং অন্তরকে প্রবোধ দিতেন। খান্দানের বাচ্চাদেরকে নিজের কাছে রেখে তাদের লেখাপড়া শেখাতেন এবং আদব-কায়দা শিখিয়ে ভদ্র ও সুশীল করে গড়ে তুলতেন। আর এ সবের ভেতর মশগুল থেকে তিনি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেন। আম্মার মুনাজাত ও কাব্যের প্রথম সংকলন "বাব-এ রহমত" নামে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমার ভাইজানের ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে তিনি আমার নামে প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় একটি পরিচিতিমূলক ভূমিকাও লিখেন। গ্রন্থটি প্রভূত জনপ্রিয়তা পায় এবং অল্পদিনেই ঘরে ঘরে এর কপি পৌঁছে যায়।

মুসলিম ঘরের মেয়েরা এবং দো'আ ও মুনাজাতে অভ্যস্ত মহিলারা বইটি পড়ে দো'আ ও মুনাজাতের স্বাদ লাভ করে।

নিজের খান্দান, অধিকন্তু অন্যান্য মুসলিম শিশুদের জন্য তিনি আরেকটি বই লিখেন। এতে তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ ছাড়াও উত্তম দাম্পত্য সম্পর্কের আদব-কায়দা ও নীতিমালা, পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ঘর-গৃহস্থালী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কয়েক বছর পর এ বইটিও "হুসনে মু'আশারাত" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং জনপ্রিয়তা পায়। আমার আম্মা রান্না-বান্নার তথা পাক-প্রণালী বিষয়েও অদ্ভূত উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ বিষয়েও "যায়েকা" নামে বই লিখেন যা ১৯৩০ সালে লাখনৌর নামী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ও জনপ্রিয় হয়।

আমাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন

এদিকে আমার নিয়মিত লেখাপড়ার পর্ব শুরু হল। আম্মা হাতে একটি কাজ পেলেন। যতদিন রায়বেরেলীতে ছিলাম আমার দেখাশোনা এবং আমার নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দানের মাঝেই তিনি মশগুল থাকতেন। কুরআন মজীদের কয়েকটি বড় বড় সূরা তিনি এ সময় আমাকে মুখস্থ করিয়েছিলেন। স্নেহের ক্ষেত্রে, মায়া-মমতার বেলায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তদুপরি ছোট বেলায় আব্বার মারা যাওয়ায় আমার মনস্তুষ্টি সাধনে অপরাপর মায়েদের তুলনায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দু'টো ব্যাপারে তিনি খুবই কঠোর ছিলেন। তন্মধ্যে একটি হল, নামাযের ক্ষেত্রে অলসতা তিনি আদৌ বরদাশ্‌ত করতেন না। কখনো যদি আমি এশার নামায না পড়েই শুয়ে পড়তাম কিংবা ঘুমিয়ে যেতাম, তা ঘুম যত গভীর ও গাঢ়ই হোক না কেন, ঘুম থেকে তুলে আমাকে নামায পড়াতেন। নামায না পড়ে আমাকে কখনো ঘুমুতে যেতে দিতেন না। ঠিক তেমনি ফজরের আগেই আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, তারপর মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন, এরপর কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের জন্য বসিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তিনি বরদাশ্‌ত করতেন না এবং সেক্ষেত্রে স্নেহ-মমতাকে আদৌ প্রশ্রয় দিতেন না তাহল, ঘরের খাদেমার কোন ছেলেমেয়ে কিংবা বাড়িতে কাজ-কাম করে খায় অথবা গরীব শ্রেণীর লোকদের ছেলেমেয়ের সাথে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি কিংবা অন্যায় করলে অথবা তাদের কারুর প্রতি অহংকার ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে তিনি আমাকে দিয়ে তার কাছে কেবল মাফ চাইয়ে নিতেন না, বরং হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতেন। এতে আমাকে যত

যিল্লতির সম্মুখীনই কেন হতে না হোক তিনি শুনতেন না। এথেকে জীবনে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। জুলুম করা, অন্যায় করা, অহংকার ও বড়াই করাকে আমি ভয় করতে শিখেছি। অপরের মনে কষ্ট দেওয়া, অন্যকে অপদস্থ করা ও হেনস্থা করাকে কবীরা গুনাহ ভাবতে শিখেছি। এর ফলে নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করাকে আমার কাছে চিরদিন সহজ মনে হয়েছে। যখন লাখনৌ যেতাম চিঠি-পত্রের মাধ্যমে আমাকে উপদেশ দিতেন। এখন তাঁর সকল আশা-আকাংক্ষা, কামনা-বাসনা ও চিত্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম আমি। আমাকে আমার পূর্বসূরীদের সঠিক স্থলাভিষিক্ত, আমার খ্যাতনামা পিতার সত্যিকার চিহ্ন, আপন খান্দানী বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক, কেবল খান্দানের নয়, বরং ইসলামের নাম আলোকোজ্জ্বলকারী, দীনের মুবাল্লিগ ও দাঈ হিসেবে দেখার আকাংক্ষা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আকাংক্ষা ও জীবন-প্রদীপ যার শিখা থেকে তাঁর মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন টিকে ছিল। সব সময় কেবল তারই চিন্তা, সর্বদা এরই ধ্যান-জ্ঞান, সব সময় তারই দো'আ ও তারই আলোচনা।

আমার লাখনৌ অবস্থান এবং আমার প্রাথমিক শিক্ষা লাভকালে তিনি আমাকে যেসব লম্বা ও বিস্তারিত চিঠি লিখেছেন সে সবের নির্বাচিত ভাণ্ডার আলহ'ামদু লিল্লাহ আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এগুলো তাঁর আন্তরিক ও হৃদ্যিক আবেগের দর্শন, বরং তাঁর কামালিয়াত ও আল্লাহপ্রদত্ত গুণাবলীর এ্যালবাম বিশেষ যা আল্লাহ তা'আলা একেবারে গায়বীভাবে তাঁকে দান করেছিলেন এবং যা ছিল তাঁর জীবনের আসল পুঁজি ও সম্পদ। শিক্ষিত ও দীনদার মুসলিম পিতামাতা তার সন্তানদেরকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন তার বিস্তৃত ভাণ্ডারের মধ্যে আল্লাহ্‌র এই নেক বান্দীর, যিনি একটি সীমিত গ্রামীন পরিবেশে চোখ মেলেছিলেন এবং যিনি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত লেখাপড়া শিখেছিলেন, লিখিত পত্রগুলো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এগুলো ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন জ্ঞানগত ও ধর্মীয় স্মৃতি যদি নাও থাকত তবুও এগুলোই যথেষ্ট হত।

আমাদের খান্দানে ইংরেজী লেখাপড়া তখন মহাধুমধামে ও জোরে-শোরে চলছে। জমিদারী থেকে মুক্তি, যুগের চাহিদা, বড় বড় পদের লোভ, উন্নতিকারীদের উদাহরণ-এসবগুলোই ছিল এর আন্দোলক ও হতবুদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। বড় বড় দৃঢ়চেতা পুরুষদের পা পর্যন্ত এই স্রোতে টলমল করছিল। স্বয়ং আম্মার আপন ভাগনে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। একজন ভ্রাতুষ্পুত্রও আমেরিকা

গিয়েছিলেন এবং সে সময় সেখানে লেখাপড়া করছিলেন। তার চিঠি আসত এবং পড়ে শোনা হ'ত। আমাদের আরেক আত্মীয় জার্মানী ও জাপান গিয়ে উচুঁ ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। আরেক আত্মীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হন। তিনিও লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডন গিয়েছিলেন এবং আমার কৈশোরেই সেখানে থেকে ফিরে এসে বড় পদে যোগদান করেছিলেন। আমি নিজে তখন লাখনৌয়ে লেখাপড়া করি। গোটা পরিবেশ ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আহ্বান জানাচ্ছিল। আমার মরহুম ভাই সাহেব আমার জন্য আরবী ধর্মীয় শিক্ষায় উপযুক্ত ও পারদর্শী হবার পথই বাছাই করেছিলেন। তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে, আমাকে এই পথই বেছে নেওয়া উচিত। কোন কোন আত্মীয়-বান্ধব তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন এই বলে যে, এতিম ভাইটিকে আরবী পড়াচ্ছে ও মোল্লা বানাচ্ছে। আমার ভাইজান মরহুম এক বিশেষ মেযাজ ও খাস আন্দাজের লোক ছিলেন। অহেতুক তর্ক-বির্তক ও কথা কাটাকাটির সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। তিনি এসব কথার এমন এক জওয়াব দেন যার কোন উত্তর তাদের কাছে ছিল না। তিনি বলেন যে, এর কোন দরকার নেই আমাদের। আব্বাজান (জীবিত থাকলে) তাকে যা পড়াতেন আমি তাকে তাই পড়াচ্ছি। ভাইজানের এই সিদ্ধান্ত ও আকাংক্ষার ওপর আম্মার প্রেরণা ও উৎসাহ, তাঁর ঈমানী শক্তি এবং পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি তাঁর নিরুত্তাপ মানসিকতা ও অনীহা সোনায় সোহাগা প্রমাণিত হয়।

কয়েকটি প্রশিক্ষণমূলক পত্র

এক সময় আমার স্বভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা দেয় এবং ইরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে। ভাইজান কোন পত্রে কিংবা রায়বেরেলীর কোন সফরে আম্মাকে গিয়ে আমার এই মানসিকতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এরপর তিনি আমাকে যে পত্র লিখেন তা থেকে তাঁর আন্তরিক ধ্যান-ধারণা, অন্তর্গত প্রেরণা, ঈমানী শক্তি ও ধর্মের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসার গভীরতা আঁচ করা যাবে। সম্ভবত ১৯২৯ কিংবা '৩০ সালের কোন এক সময়ে লিখিত সন-তারিখবিহীন এই পত্রের একটি অংশ এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

"আলী! দুনিয়ার হালত খুবই বিপজ্জনক। এই সময় যারা আরবী লেখাপড়া শিখছে তাদের ঈমান-'আকীদাই যখন ঠিক নেই সেখানে যারা ইংরেজী পড়ছে তাদের কাছে আর কীইবা আশা করা চলে? 'আবদ'[১]ও তালহার মত কয়জনকে

---

১. ভাইজান সাইয়েদ আবদুল আলী পরিবারে এনামেই পরিচিত ছিলেন। মাওলানা তালহা ছিলেন আমার ফুফা। তিনি দীর্ঘ কাল যাবত লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৭০ সালে করাচীতে ইনতিকাল করেন।

পাবে? আলী! লোকের বিশ্বাস যে, যারা ইংরেজী পড়ছে তারা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করছে, কেউ ডেপুটি হচ্ছে, কেউ জজ, কমপক্ষে উকীল-ব্যারিষ্টার তো হবেই হবে। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি ইংরেজীওয়ালাদের জাহিল ভাবি এবং এই লেখাপড়াকে নিষ্ফল ও বেকার মনে করি। বিশেষ করে এই সময়ে জানা নেই কি হবে এবং কোন ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। সে সময় অবশ্য প্রয়োজন বেশি ছিল। এই পদমর্যাদা তো একজন চামারও লাভ করতে পারে। এটা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এমন কে আছে যে এর থেকে বঞ্চিত? আমাকে তো এমন কিছু হাসিল করতে হবে যা এই মুহূর্তে দুর্লভ, যা কেউ হাসিল করতে পারে না, যা দেখার জন্য আমার চোখ উদগ্রীব এবং যা শোনার জন্য কান অধীর। আকাংক্ষায় মন আমার ছটফট করছে কিন্তু যা আমি দেখতে চাইছি তা চোখে পড়ছে না।

"আফসোস! আমরা এমন এক সময় জন্মেছি। 'আলী! তুমি কারও কথা শুনো না। যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও এবং আমার হক আদায় করতে চাও তাহলে সেই সব সিংহপুরুষের দিকে তাকাও যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা কি ছিল? শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব, শাহ 'আবদুল 'আযীয সাহেব, শাহ 'আবদুল কাদির সাহেব, মওলভী মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব[১] এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভেতর খাজা আহমদ[২] ও মওলভী মুহাম্মাদ আমীন সাহেব[৩] মরহুম যাঁদের জীবন ও মরণ সে সময় ঈর্ষাযোগ্য ছিল। কী রকম শান-শওকতের সঙ্গে তাঁরা দুনিয়াতে থেকেছেন এবং কেমন সুন্দরভাবে তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে লাভ করা যেতে পারে? ইংরেজী মর্যাদাধারী তোমাদের পরিবারে সকলেই এবং আরও হবে, কিন্তু অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই।

---

১. মাওলানা আবু মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম ছিলেন প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম। তিনি আমার নানা সাইয়েদ শাহ যিয়াউন-নবীর মুরীদ ছিলেন। ছিলেন একজন রব্বানী ও হক্কানী আলেম। তাঁর ওয়াজ খুবই প্রভাব মণ্ডিত হত এবং লোকে কাঁদত। তাঁর একটি ওয়াজের দ্বারা আমাদের পরিবারের যুবকদের বিরাট সংশোধন ও পরিশুদ্ধি ঘটে এবং তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ৬ই যিলহজ্জ ১৩১৯ হি. মক্কা মু'আজ্জামায় তিনি ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল মু'আল্লায় তাঁর কবর অবস্থিত।

২. খাজা সাইয়েদ আহমদ নাসিরাবাদী ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের খলীফা এবং সাইয়েদ শাহ যিয়াউন নবী ও হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীনের পীর ও মুরশিদ। কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রচারে ও তওহীদী আদর্শের প্রসারে এবং মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার সংশোধনে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। ১২৮৯ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীন নাসিরাবাদী রায়বেরেলী, সুলতানপুর ও প্রতাপগড় জেলায় এবং এসবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাট সংস্কারমূলক খেদমত আনজাম দেন এবং শির্ক ও বিদ'আতের মূ-লোৎপাটনে অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। ১৩৪৯ হিজরীর জুমাদাল আখিরায় তিনি ইনতিকাল করেন।

এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন। তাঁদের ইংরেজীর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ কিংবা প্রীতি ছিল না। তাঁরা ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিলেন। তাহলে এই মর্যাদা তাঁরা কিভাবে লাভ করলেন? 'আলী! আমার একশ'টা সন্তান থাকলেও আমি তাদেরকে এই শিক্ষাই দিতাম। এখন কেবল তুমিই আছ। আল্লাহ তা'আলা আমার নেক নিয়তের পুরস্কার দিন যেন এক শত সন্তানের গুণাবলী আমি তোমার থেকে পেতে পারি এবং এই জগতে ও পরজগতে সৌভাগ্য ও সুনামের অধিকারী হই, সন্তানের মা হিসেবে কথিত হই। আমীন! ছুম্মা আমীন! ইয়া রাব্বা'ল-'আলামীন!

"আমি আল্লাহ্‌র কাছে সব সময় দো'আ করি যেন তিনি তোমাকে হিম্মত দান করেন এবং তোমার মধ্যে সেই আগ্রহ জাগিয়ে দেন যাতে তুমি সেই মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে পার এবং তিনি যেন তোমাকে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে আদায় করার তৌফীক দেন। আমীন! এর চেয়ে বেশী আমার আর কিছু চাইবার নেই। চাইবার ইচ্ছাও নেই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যেন সেই মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তোমাকে দৃঢ়পদ রাখেন। আমীন!

"আলী! তোমাকে আরও একটি উপদেশ দিচ্ছি এই শর্তে যে, তুমি তা মেনে চলবে। তোমার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া কিতাবগুলো[১] কাজে লাগাও এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন কর। কোন কিতাব যদি না থাকে তবে সেটি 'আবদূ-এর মতামত সাপেক্ষে কিনে ফেল। অবশিষ্ট কিতাবাদি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এর ভেতর দিয়ে তোমার সৌভাগ্য প্রকাশিত হবে এবং কিতাবগুলোও নষ্ট হবে না আর বুযুর্গরাও খুশী হবেন। এই সৌভাগ্যে আমার অপার ইচ্ছা রয়েছে যে, তুমি এসব কিতাবের খেদমত করবে।"

আমার আম্মার সবচে' বড় আকাংক্ষা ও চিন্তা ছিল এই যে, আমি যেন আমার বড় ভাইয়ের নির্দেশনায় চলি এবং তিনি যা বলেন আমি যেন চোখ বুঁজে তা মেনে নিই ও সেই মুতাবিক কাজ করি। তিনি তাকে অর্থাৎ আমার বড় ভাইকে সকল গুণের আধার এবং আমাদের খান্দানের মর্যাদার প্রতীক ভাবতেন। আমাদের খান্দানে হযরত শাহ আবদু'ল-কাদিরের কুরআনু'ল-করীমের তরজমা ও তাঁর তফসীর মূদিহু'ল-কুরআনকে (যা তাঁর প্রাচীন তরজমাসমূহের হাশিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে) সর্বদাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে এক রকম মহিলাদের ও লেখাপড়া জানা পুরুষদের পড়াশোনার সিলেবাস গণ্য করা হ'ত। মনে হয়

১. পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে রক্ষিত কিতাবাদি। এসবের প্রতি লেখকের তারুণ্য জনিত উপেক্ষার কথা জানতে পেরে তিনি এর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভাইজানের অব্যাহত তাকীদ সত্ত্বেও প্রতিদিন এটা পড়া ও চোখ বুলাবার ক্ষেত্রে আমি অলসতা করতাম এবং বেশির ভাগ সময় সাহিত্যমূলক ও হাল্কা ধরনের বই-পুস্তক পড়ার ভেতরই মগ্ন থাকতাম। সম্ভবত ভাইজান কোন পত্রে আম্মার নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকবেন। অতঃপর আম্মা আমাকে যে দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছিলেন এখানে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে।

"যখন তুমি এখানে ছিলে তখন আবদু বিশেষভাবে লিখেছিল যে, শাহ 'আবদু'ল-কাদির-এর তরজমা দৈনিক পড়বে ও সে সম্পর্কে ভাববে, চিন্তা করবে। কিন্তু তুমি তার হুকুম তামিল করোনি। আমি তালাশ করে এনেছি এবং প্রতি দিন বলেছি আর তুমি তা এড়িয়ে গেছ এবং এ বই সে বই নিয়ে মেতে থেকেছ। আমার অত্যন্ত অপসন্দনীয় ছিল, কিন্তু এতটা খারাপ ভাবতে পারিনি। সেই চিঠি দেখে আমার যতটা কষ্ট হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। এমনিতেই তো তখনকার অবস্থাদৃষ্টে আমার নিজেরই এতমিনান ছিল না। কিন্তু এক্ষণে এই মুহূর্তে সমস্ত আশা-ভরসা বিপজ্জনক ও ভয়াবহরূপে দেখতে পাচ্ছি। 'আলী! তোমার এই অযোগ্যতা ও অপদার্থতা আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছে। তোমার থেকে তো আমি এমনটি আশা করি না আর এমত আশাও ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল যে, তুমি তোমার প্রিয় ভাইজানের একেবারে সমচিন্তার ও অনুগত হবে। আর এই ধারণাতেই আমার তুষ্টি ও প্রশান্তি ছিল। কিন্তু আফসোস! এমন ভাই, যে তোমাকে নিজের জানের চেয়েও ভালবাসে, স্নেহ করে এবং নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য তোমাকে গড়ে তুলবার জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, তার সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করে দেবে, তার সমস্ত হক ভুলে যাবে এবং বেপরওয়া ও স্বাধীন হয়ে যাবে। এতো তোমার সেই ভাই যে তোমাকে এমন এক নাযুক মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছিল, তোমার সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল যখন একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে অস্থিরতা প্রকাশ করতাম। সে নিজেই পেরেশান ছিল। তোমার জন্য সে নিজেই পরিশ্রম করেছে। তুমি যা কিছু লাভ করেছ তা তারই বদান্যতা ও অনুগ্রহের ফসল। দেখ, এটা 'ইল্‌ম আর 'আমল তাকে বলে। তুমি সাহিত্যের[১] ময়দানে যতই অগ্রসর হও না কেন তুমি কখনই 'আবদু'র সমকক্ষ হতে পারবে না এবং তার মধ্যে যেসব মহৎ গুণাবলী রয়েছে তাও তুমি

---

১. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন জনাব খলীল আরব যাঁর হাতে আমার এ ময়দানে প্রথম হাতে খড়ি। এ ময়দানের শীর্ষে উপনীত হওয়া ছিল আমার ঐকান্তিক সাধ ও প্রবল আগ্রহ।

সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা এই মুহূর্তের ধ্যান-ধারণা তোমাকে সেই সুযোগই দেবে না।

"আবদু এমন একজন আলেম, পণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, যদি তুমি তার মত আরেকজন দেখতে চাও তাহলে পাবে না। তোমাদের খান্দানের যা কিছু ভাল সব কিছুর সমাবেশ আবদু'র ভেতর পাবে।"

সামনে অগ্রসর হয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ, উদ্যমশীলতা ও চিরাচরিত ছাত্রসুলভ গুণাবলীর প্রতি উপদেশ দান করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

"সব কিছুর প্রতি আগ্রহ অর্থহীন ভেবো। যাদের এ ধরনের মন-মেযাজ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। একজন ছাত্রকে কেবলই পড়াশোনা করা উচিত। পরিধেয় কাপড় ছেঁড়া হোক কিংবা জুতা ফাটা, এতে লজ্জার কিছু নেই, বরং এর জন্য গর্ববোধ করা দরকার। এমন অবস্থাই কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ হয়। এ সব কষ্টের মধ্যেই 'ইল্‌ম-এর কদর হয়। বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান সেই যে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ করে আর তা হল শরীয়তের পাবন্দী। এক্ষণে 'ইল্‌ম সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। যে কেউ তা সহজেই লাভ করতে পারে। দুই-চারটে বই-পুস্তক কিংবা কিতাবাদি পড়ল, ব্যস! ছেলে আমার লায়েক হয়ে গেছে। হাজারও বিপদ-আপদ চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। এই চিঠি যদি মন চায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখবে এবং বারবার পড়বে।"

আরও একটি পত্রে দীনী 'ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও আরবী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান ও এক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন এবং প্রাচীন কালের উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গদের পদাংক অনুসরণের ওপর জোর তাকীদ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"এখন আরবী শেখার জন্য পরিশ্রম কর। কিন্তু তা অনিয়ম বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নয়। শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। যদি শরীর-স্বাস্থ্য ভাল তো সব ভাল, যা চাও হাসিল করতে পারবে। যদি তুমি এতটা পরিশ্রম আরবীর বেলায় করতে তবে এতদিনে অনেক কিছুই হাসিল হয়ে যেত।[১] মনোযোগ দিয়ে এখনও যেসব কিতাব পড়নি, পড়তে পারনি সেগুলো পড়ে ফেল। যতটা সম্ভব আগের যুগের আলিম-উলামার মত যোগ্যতা সৃষ্টি কর। যেগুলো শরীয়ত বিরুদ্ধ নয় সেগুলোই শিখতে চেষ্টা কর। সমস্ত মসলা-মাসায়েল

১. এ সময় আমি পাগলের মত কোন প্রকার নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই ইংরেজী শেখার সাধনায় মত্ত হয়েছিলাম। ফলে আমার শরীর স্বাস্থ্যের ও চোখের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

খুব ভালভাবে অবগত হও। এই মুহূর্তে এই 'ইলমেরই প্রয়োজন। এখনকার আলিম-উলামা কিছু জানে না এবং তারা ফেতনা সৃষ্টি করে। আমার অন্তরের কামনা, তুমি 'ইল্‌ম-এর ময়দানে সেই মর্যাদা অর্জন কর যে মর্যাদা বড় বড় আলিম-উলামা অর্জন করেছিলেন, যাঁদের দেখবার জন্য আমার চোখ ব্যাকুল ও উন্মুখ, যাঁদের কথা শোনার জন্য কান অধীর আগ্রহী এবং দিল বেকারার। 'আলী! এর চেয়ে বেশী আমার আর কোন আকাংক্ষা নেই, অভিলাষ নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে দো'আ করছি, তিনি যেন তোমাকে সেই সব গুণাবলী দান করেন যাতে সেই যুগ আবার ফিরে আসে। আমীন!"

অপর এক পত্রে তিনি লিখছেন ঃ

"আলী! আল্লাহ্‌র অপার রহমতের কাছে আমার গভীর প্রত্যাশা যে, তুমি সম্মান ও সফলতা দৃষ্টে প্রভাবিত হবে না। কেননা অন্যের সম্মান ও সফলতা দৃষ্টে প্রভাবিত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। এগুলো অস্থায়ী ও নশ্বর। ঈর্ষাযোগ্য তো তাই যা হাজারে একজনে পায় আর এ পাওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়।

قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

বন্টনকারী মহান সত্তা
নিজহাতে করেছে বন্টন
যাকে যার যোগ্য পেলো
তাকে তা-ই করেছে অর্পণ।

"তোমার এজন্য গর্ব করা উচিত, অত্যন্ত সাহস ও শক্তির সাথে করা উচিত। আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করি যে, তিনি যেন তোমার মধ্যে এর প্রতি এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন যাতে তুমি সব কিছুর ওপর একে প্রাধান্য দাও। তুমি যদি জজ হতে কিংবা এ ধরনের আরও কোন সম্মান বা পদমর্যাদা লাভ করতে যা সাধারণে পেয়ে থাকে তবুও আমি তার ভেতর হাজারো বিপদাশংকা অনুভব করতাম। তিনি আমাকে সর্বপ্রকার মন্দের হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এমন সর্বোত্তম সূরত পছন্দ করেছেন যাতে স্বয়ং রক্ষকও পাহারাদার হবে। আমার চিন্তার কোন দরকার নেই, কেবল একটাই চিন্তা যেন আমার হৃদয় মানস সর্বদা এমন এক খুশীতে ভরপুর ও উদ্বেলিত থাকে যা কোন বড় থেকে বড় মর্যাদার অধিকারী লোকেরও নেই।"

তাঁর বড় অভিলাষ ছিল যে, আমি নির্ভেজাল ধর্মীয় ওয়াজ-নসীহত করব, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিধি-বিধান শোনাবার যোগ্য হব এবং লোকে আমার

দ্বারা ধর্মীয় উপকার পাবে। একই পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

"ইনশাল্লাহ তোমাকে রমযানে ওয়াজ করতে হবে। তৈরি হও। আল্লাহ তা'আলা আমার অভিলাষ পরিপূর্ণরূপে পূর্ণ করুন। আমীন!"

আমার দীর্ঘ সফর, আম্মার ত্যাগ

আমার আম্মার জন্য কঠিন পরীক্ষা ও মুজাহাদা নয়, বরং বলা চলে জিহাদে আকবর ছিল আমার দীর্ঘ সফর যা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হেকমত তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশলের কারণে আমার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যে মা ছিলেন আপাদমস্তক স্নেহ-করুণার মূর্ত প্রতীক, যিনি ছিলেন কমযোর, ছিলেন একজন মমতাময়ী নারী, যিনি লাখনৌয়ে থাকাকালে আমার চিঠি পেতে দেরী হলে অস্থির হয়ে পড়তেন– তাঁর জন্য দেশ ও দেশের বাইরে আমার দীর্ঘ সফরকে জিহাদে আকবর না বলে আর কি বলা যায়। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যেই তাঁকে জিহাদের অনেক অনেক ছওয়াব দিয়ে থাকবেন।

সম্ভবত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর খেদমতে তফসীর পড়ার গভীর আগ্রহ এবং তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হবার মানসে আমি লাহোর যাই। সেখানে থেকে কাদেরিয়া তরীকার একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ, যিনি স্বয়ং হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর পীর ছিলেন, হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরীর সাক্ষাত ও দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে আমি পাঞ্জাব ও সিন্ধু সীমান্ত খানপুর যাবার নিয়ত করি এবং মাকে আমার সংকল্পের কথা অবহিত করি। এর প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেন ঃ

"তুমি সিন্ধু যাবার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছ। এর ফলে অবশ্যই আমার চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। জানি না তা কোন্ দিকে এবং সেখানকার হালই বা কেমন? আমি এও জানি না তোমাকে সেখানে কত দিন থাকতে হবে। যদি 'আবদূ ও তালহার মতও তাই হয় তাহলে আপত্তি নেই। তুমি যদি সেখানকার সকল অবস্থা আমাকে লিখে জানাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পরিপূর্ণ সাফল্য দান করুন। ব্যস! এটাই আমার কামনা। এই কারণেই আমি তোমার দূর-দরাজ সফর মেনে নিয়েছি। নইলে এ ধরনের মন-মানসের অধিকারী মানুষের জন্য এটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ও অসম্ভব ছিল। আমি তোমাকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) হেফাজতে দিয়ে দিয়েছি। তিনিই উত্তম হেফাজতকারী ও উত্তম সঙ্গী। আমি আর কী করতে পারি?

تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہونچا نہیں سکتا

عناصر چھو نہیں سکتے فلك دھمكا نہیں سكتا

ক্ষতি তার কে করবে
তুমি যাকে দিয়েছো আশ্রয়?
কে করে অনিষ্ট তার
কে পারে দেখাতে তাকে ভয়?

"ব্যস! একথা বলে আমি আমার মনকে প্রবোধ দিই এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাঁর অপার করুণার ওপর। আল্লাহ তা'আলার সমীপে সবসময় দো'আ করছি যেন তিনি তোমাকে নেক কাজের তৌফিক দান করেন এবং তোমাকে 'ইলমে দীনের পূর্ণ মর্যাদায় উপনীত করেন, তোমাকে দৃঢ়পদ রাখেন যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার সুনাম হয়।"

এরপর তো সফরের অব্যাহত সিলসিলা শুরু হয় এবং দেশের বাইরে এমন সব দীর্ঘ সফর শুরু হয় যার ভেতরে কোন কোনটি বছরের অধিক কাল ছিল। এ সময় মিসর, সিরিয়া, হেজায অবস্থানকালীন সেসব ঠিকানায় তাঁর যেসব পত্র এসেছে তা ছিল মাতৃস্নেহ ও ঈমানী শক্তির এক আকর্ষণীয় সমন্বিত রূপ। দীর্ঘ হবার ভয়ে সেসব পত্রের উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হল না।

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি আগ্রহ

১৯৪০ (১৩৫৯ হি.) সালে হযরত মাওলানা ইল্‌য়াস (র)-এর খেদমতে সর্বপ্রথম যাবার সুযোগ ঘটে। আর এখান থেকেই আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ ছিল এক নতুন জগতের আবিষ্কার এবং এক নতুন ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবতার প্রকাশ। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি আমার কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ, যাদের অধিকাংশই দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ও ছাত্র ছিলেন, লাখনৌ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাবলীগী জামা'আতের উসুল মুতাবিক এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াসের রূহানী অভিভাবকত্বাধীনে ভাঙাচোরা তাবলীগী কাজ শুরু করি। এর ফলে সবচে' বেশি খুশী হন আমার আম্মা ও ভাইজান। আর এ দু'জনেরই জীবনের মূল আকাংক্ষা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল ধর্মের প্রচার এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ। কিছু কাল পর মনে হয় আমার আম্মা কোন চিঠি কিংবা কারোর কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার ভেতর সেই আগেকার যত আগ্রহ-উদ্দীপনা নেই। এতে তিনি খুবই চিন্তিত ও ভাবিত হন। এ সময়কার এক পত্রে তিনি লিখছেন ঃ

"তাবলীগ তথা দীনের প্রচার-প্রসারের কাজে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াতে উন্নতি

হয়। সূচনাতে তোমার ভেতর যেই উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ ছিল তা নেই। 'আবদু'র ও এ ব্যাপারে কিছুটা কমতি দেখা যাচ্ছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রথম দিককার অবস্থা শেষ পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগ্রহও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন তোমাকে দিয়ে সেই সব কাজ করিয়ে নেন যা তিনি তাঁর নেক ও মকবুল বান্দাদের দ্বারা করিয়েছেন এবং তিনি যেন তোমাকে অহংকার, গর্ব ও প্রদর্শনেচ্ছা থেকে রক্ষা করেন, তোমার উন্নতি ও কামিয়াবী যেন ঈর্ষাযোগ্য হয়। আমীন! আল্লাহ তা'আলা আমার সমস্ত দো'আ কবুল করুন। আমীন!"

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র)-এর একটি পত্র

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস রহমাতুল্লাহে আলায়হে ও তাঁর কাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বাড়িতে তাঁর ও তাঁর বুযুর্গীর ব্যাপারে সব সময় আলোচনা হ'ত। স্বয়ং আমি আমার চিঠিপত্রে কিংবা মুখে আম্মা ও ভাইজানের এ কাজের (তাবলীগী কাজের) ব্যাপারে আনন্দ ও পছন্দনীয়তার কথা মাঝে মধ্যেই বলতাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র) তাঁর কোন কোন পত্রে এতদসম্পর্কে তাঁর আনন্দ ও প্রসন্নতার কথা প্রকাশ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত ভাষায় আম্মার কথা লিখেছেন। এক পত্রে তিনি লিখছেন ঃ

" আপনার, আপনার শ্রদ্ধেয় ভাই, সবচে' বড় কথা - হযরত আলিয়া মাখদূমা মুহতারামা ওয়ালেদা সাহেবার একে কবুলিয়াতের দৃষ্টিতে মনোযোগ সহকারে দেখা - এ সবই জনাবের মহত্ত্বের সাক্ষ্য ও তবিয়তের সময়োপযোগিতার সংবাদ দিচ্ছে এবং আমার মত নাচিজ ও নিঃস্ব গরীবের জন্য এক বরকতময় আঁচলের ছায়াতলে আগমনের সংকেত দিচ্ছে। ঠিক তেমনি এই কাজের জন্য আপন লক্ষ্যে পৌছুবার আশা দিয়ে দুনিয়াতে কিছু দিন অবস্থানের ও মূল আঁকড়ে ধরার আশা দিচ্ছে।

اللهم اصنع بنا ما انت اهله ولا تصنع بنا ما نحن اهله

"হযরত ওয়ালেদা সাহেবাকে আমার সালাম দেবেন এবং দো'আর জন্য দরখাস্ত পেশ করবেন।"

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (র)-এর হাতে বায়'আত, অতঃপর হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র)-এর হাতে বায়'আতের নবায়ন

এই সম্পর্ক এতটা বৃদ্ধি পায় যে, ১৩৬২ হি. (১৯৪৩ খৃ.) -র রজব মাসে আমার বিনীত অনুরোধে ও আগ্রহক্রমে হযরত মাওলানা ইলয়াস (র) তাঁর সঙ্গীসাথী ও ভক্ত সেবকবৃন্দসহ লাখনৌ আগমন করেন এবং গোটা সপ্তাহব্যাপী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায় অবস্থান করেন। অতঃপর সেখান থেকে আমাদের পিতৃ আবাসভূমি দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলীতে ১৩৬২ হি. রজব মাসের ২২ তারিখে রোজ রবিবার পদধুলি দেন। হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া, হযরত হাফেজ ফখরুদ্দীন পানীপথীসহ আরও কয়েকজন এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। আমার আম্মা তখন পর্যন্ত কোন বুযুর্গের কাছে বায়'আত হননি। ইতোপূর্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যদ্দরুণ তাঁর ধারণা ছিল যে, রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আম্মা তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার হাতে বায়'আত হবার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন নি যদিও তিনি একজন শায়খ-ই কামিল ছিলেন। কিন্তু এ সময় তাঁর দিলে বায়'আত হবার জন্য গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি আমার কাছে তাঁর এই আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আমি আম্মার এ আগ্রহের কথা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র.)-এর খেদমতে পেশ করি। মাওলানা এস্তেখারা সালাত আদায়ের পর তাৎক্ষণিকভাবে এই আবেদন কবুল করেন। আম্মা অতঃপর অপরাপর মহিলাদের সঙ্গে বায়'আতভুক্ত হন। মাওলানা জীবিত থাকা অবধি আম্মার এই সম্পর্ক অটুট ছিল। মাওলানার ইনতিকালের পর একবার সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র) লাখনৌ আগমন করলে, যিনি মাঝে-মধ্যেই আমাদের এখানে আসতেন এবং আসা-যাওয়ার সম্পর্ক বরাবর অব্যাহত ছিল, তাঁর হাতে পুনরুপি বায়'আত হন। আমাদের গোটা পরিবারই এসময় তাঁর বায়'আতভুক্ত ছিল। অতএব মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র.)-এর ইনতিকালের পর মাওলানা মাদানী (র.)-র হাতে বায়'আত হবার আগ্রহ দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

হজ্জ্ব ও যিয়ারত

১৩৬৬ হিজরীতে (ইং ১৯৪৭) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ এবং হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (র.) দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যাপদেশে আমাকে হেজায

যাবার জন্য বলেন। তখন পর্যন্ত হজ্জ ও যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ আমার ভাগ্যে জোটেনি। আল্লাহ তা'আলা আমার মনে এই ধারণার উন্মেষ ঘটালেন যে, এই সুযোগে আমার আম্মা, স্ত্রী ও বোনকেও সাথে নিয়ে যাই এবং আমার সাথী ও সহযোগী হিসেবে আমার বড় ভাগিনা সুপ্রিয় মওলভী মুহাম্মদ ছানীকেও সাথে নিই। আমাদের বংশে আল্লাহ্ তা'আলার বহুবিধ নে'মত ও সৌভাগ্য সত্ত্বেও হজ্জের সিলসিলা দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। বংশের সর্বশেষ যিনি হজ্জ করেছিলেন তিনি আমার ভাইজান যিনি ১৩৪৪ হি. সালে হজ্জ করেছিলেন। আব্বা এবং বংশের অনেকে তীব্র আকাংক্ষা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে এই সুযোগ পাননি।

১৩৬৬ হিজরীর ৭ ই শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার (২৬ শে জুন, ১৯৪৭) পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট আমাদের এই ছোট্ট কাফেলাটি করাচীর পথে হেজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। করাচীতে তাবলীগী জামা'আতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী এবং করাচীর একজন বড় ব্যবসায়ী জনাব হাজী আবদুল জব্বার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আবদুস সাত্তার দেহলভীর বাংলোয় আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের গোটা পরিবার আমাদের মেহমানদারী করে। আমরা এগারো দিন করাচীতে ছিলাম। এরপর ইসলামী জাহাজে আমরা হেজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। তাবলীগী জামা'আতের একজন বিশিষ্ট কর্মী আমাদের সাথে ছিলেন। আম্মা, আমার স্ত্রী ও বোন প্রথম শ্রেণীর কেবিনে ছিলেন আর আমরা দু'জন ডেকের যাত্রী ছিলাম।

এই সফরে প্রতি পদক্ষেপে যেই গায়বী মদদ কল্পনাতীতভাবে জাহাজের সঙ্গী- সাথীদের ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণরূপে, যা হেজায ভূখণ্ডে আল্লাহ্র সাহায্য-সহযোগিতা আকারে পেয়েছিলাম– তাকে আমি আম্মার মকবুলিয়াত ও তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার দরুণ আল্লাহ্র রহম-করমেরই ফল বলে মনে করি। এ ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনাময় সফর এবং এরকম প্রকাশ্য সাহায্য এর পরবর্তী সফরগুলোতে যা আরো অনেকবারই হয়েছে, দেখার সুযোগ কমই হয়েছে।

আমরা যেদিন জেদ্দায় গিয়ে পৌঁছলাম সেদিন প্রথম রমযানের চাঁদ দেখা দেয়। জেদ্দায় দু'টো রোযা রেখে ৩রা রমযানের রাত্রে আমরা মদীনা তায়্যিবায় রওয়ানা হই। আমি মওলানা মনজুর নু'মানীর "আপ হজ্জ ক্যায়সে করে" নামক গ্রন্থে 'আপনে ঘর সে বায়তুল্লাহ তক' শীর্ষক নিবন্ধে এই সফরের কিছু বিবরণ পেশ করেছি। এটা ছিল সেই সফর যা আমি আমার আম্মার সঙ্গে করেছিলাম। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, মদীনায় রমযান ভাগ্যে জুটল। শাওয়াল

মাসটাও সেখানেই কাটালাম। যী-কা'দাহ মাসের বিশ তারিখ আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধি। বাবু'ন-নিসার একেবারে সামনেই মাদরাসা উলুম-এ শারী'আর একটি দ্বিতল ভবনে ছিল আমাদের আবাস। মাওলানা মাদানী রহমাতুল্লাহ আলায়হের ছোট ভাই সাইয়েদ মাহমূদের মেহেরবানীতেই এই দ্বিতল ভবনের গোটাটাই আমরা পেয়েছিলাম। আম্মার পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই জামা'আতের সাথে মসজিদে নববীতে আদায়ের সুযোগ হ'ত। এক রাত্রে ওহুদে মাওলানা সাইয়েদ মাহমূদের বাসভবনে অতিবাহিত করি এবং সারাদিন সেখানেই থাকতে হয়।

হজ্জের আগে মক্কা মু'আজ্জমা'য় টুংকু রিবাত এবং হজ্জের পর মাদরাসা ফখরিয়ায় যা হারাম শরীফের মধ্যেই অবস্থিত বাব-এ ইবরাহীমে অবস্থান করি। ফলে তওয়াফ ও সালাত আদায়ে খুবই আসানী হয়েছিল। 'আরাফাত ময়দানে আম্মা সবার থেকে পৃথক হয়ে আগাগোড়াই দো'আ ও মুনাজাতে মশগুল থাকেন। তাবলীগী সাথীবৃন্দ বিশেষ করে মাওলানা উবায়দুল্লাহ বালিয়াবী ও মুফতী যয়নু'ল-'আবেদীন লায়ালপুরীর সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে আমাদের কাফেলা খুবই আরামের মধ্যে অতিবাহিত করে। হজ্জের পর মক্কা মু'আজ্জমায় খুবই নিরাপদ প্রশান্তির সঙ্গে থাকবার সুযোগ ঘটে। সম্ভবত তিন মাস আমরা সেখানে ছিলাম।

প্রত্যাবর্তন

আমরা মদীনা তাইয়্যেবায় থাকতেই ভারত ভাগ হয় ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। মারামারি, হানাহানি ও রক্তপাতের হৃদয়বিদারক খবর একের পর এক এসে পৌঁছুচ্ছিল। ভারতের মুসলমান, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে আমাদের সকলের মন পড়ে ছিল। আমরা জানতে পারছিলাম না যে, কাদেরকে আমরা জীবিত ও সহীহ-সালামতে দেখব আর কাদেরকে একমাত্র কেয়ামতের মাঠে ছাড়া আর ইহ জনমে দেখতে পাব না। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর আমরা হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ভাইজানের পরামর্শে আমরা করাচীতে অবতরণ করি নাই যদিও আমাদের যাত্রা করাচী থেকেই করেছিলাম। আমরা বোম্বাই নামি এবং তখনকার দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত পরিস্থিতির কারণে সশস্ত্র পুলিশের হেফাজতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ বগিতে করে লাখনৌর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ি। লাখনৌ পৌঁছে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সহীহ-সালামতে দেখতে পাই এবং সবার কুশল সংবাদ শুনি।

লাখনৌ ও রায়বেরেলীতে অবস্থান

হজ্জ সমাপন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমার আম্মার অবস্থান বেশীর ভাগ রায়বেরেলীতেই থাকে। ভাইজান চাইলে লাখনৌ এসে কখনো কয়েক সপ্তাহ ও মাসখানেক থাকতেন। ২১শে যী-কা'দাহ, ১৩৮০ হিজরী রবিবার (৭ই মে, ১৯৬১) লাখনৌতে ভাইজান ইনতিকাল করেন। এই শোকাবহ ও মর্মান্তিক ঘটনা আম্মার এই বার্ধ্যকের ওপর ছিল এক দুঃসহ বোঝা। আব্বার ইনতিকালের পর আম্মার জীবনে এটাই ছিল সবচে' বড় আঘাত যা তিনি বরদাশ্ত করেন। এরপর থেকেই তিনি স্থায়ীভাবে রায়বেরেলীতেই থাকেন। কিন্তু ঐ বছরই রবী'উ'ছ-ছানী (১৩৮৯) মাসে (সেপ্টেম্বর ১৯৬৯) প্রবল বন্যা দেখা দিলে এবং আমাদের বাড়িতে পানি উঠলে বাধ্য হয়েই আমাদেরকে লাখনৌ এসে উঠতে হয় এবং প্রায় এক বছর সেখানেই থাকতে হয়। এটাই ছিল আম্মার শেষ লাখনৌ সফর। জমাদিউ'ছ-ছানী ১৯৮২ হি. (অক্টোবর ১৯৬২)-তে লাখনৌ থেকে রায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন ঘটে। এরপর তো তাঁকে দুনিয়ার বুক থেকেই আখেরাতের অন্তহীন জীবনের পথে শেষ সফরে যেতে হয়। রায়বেরেলী থেকে অতঃপর তিনি আর কোথাও যাননি।

রাত্রীকালীন ইবাদত এবং আমল-ওজীফার আধিক্য

বয়স বাড়ছিল এবং সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছিল বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা। ভাইজানের পরামর্শে ১৯৩১ সালে পরপর আম্মার দুই চোখের সফল অপারেশন করানো হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত লেখাপড়ার চাপে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করায় কয়েক বছরের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৯৪৩ সালে পরপর আম্মার দুই চোখের সফল অপারেশন করানো হয়েছিল। কিন্তু এমতাবস্তায়ও তার নিয়মিত আমলসমূহের ক্ষেত্রে পাবন্দী, দো'আ-দরূদ ও ওজীফা পাঠ, মুনাজাত প্রভৃতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি, বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পায়। কেবল কুরআন শরীফ দেখে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর থেকে আম্মাকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতে দেখেছি। রাত্রিকালীন ইবাদত-বন্দেগীর মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাত্রের শেষাংশের ইবাদত-বন্দেগীতেই তিনি বেশী মজা পেতেন। যদিও রাত্রের শেষ ভাগের আগেই স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর ঘুম ভেঙে যেত এবং তিনি জেগে উঠতেন, তারপরও তিনি ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখতে ভুলতেন না। এজন্য ঘড়ি সচল রাখা ও যাতে ঠিক টাইম দেয় সেজন্য খুবই তৎপর থাকতেন। অধিকন্তু

কখন বেলা ডুবছে কিংবা উঠছে এর প্রতি খেয়াল রাখতেন। এজন্য বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং বিভিন্ন রকমের অভিযোগ ও উপসর্গের প্রেক্ষিতে আমরা চেষ্টা করতাম যাতে তিনি অনেক আগেই ঘুম থেকে না উঠে পড়েন। কিন্তু তিনি তা মানতেন না। এরপর তিনি আমাকে তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন আমি ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাব তখন যেন আমি তাঁকে বলি। ফলে যখন আমি নিয়ম মাফিক মসজিদে যাবার আগে বলতাম যে, ভোর হয়ে গেছে তখন তিনি বড় দুঃখ ও আফসোসের সঙ্গে বলতেন যেন কিছুটা আগে হয়ে গেছে এবং কিছুটা আফসোস থেকে গেছে।

বার্ধক্যে ও মা'যুর অবস্থায় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা

শেষে নিজে থেকে নড়াচড়া করাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, কারুর অবলম্বন ছাড়া কয়েক কদম হাঁটা-চলাও কঠিন হয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপরাপর অনুগ্রহের সঙ্গে আম্মার ওপর আরেকটি অনুগ্রহ এও ছিল যে, তিনি তাঁকে এমন সব অনুগত, ফরমাঁবরদার, সৌভাগ্যবান ও সেবাপরায়ণ সন্তান-সন্ততি ও নাতি-পুতি দান করেছিলেন যারা তাঁকে কোন সময় তাঁর অসহায় ও অক্ষম অবস্থা বুঝতে দেয়নি। দীর্ঘকাল যাবত এমন খেদমত পেয়েছেন যা অনেক বড় বড় মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী নারী-পুরুষের ভাগ্যেও জোটেনি। সকলেই তাঁর খেদমত করতে ও তাঁকে আরাম দিতে উদগ্রীব ছিল এবং একে কেবল সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়, বরং ইবাদত মনে করত এবং সদা-সর্বদা এর জন্য প্রস্তুত থাকত।

আমার বড় দু'জন বোন আছেন এবং দু'জনই বছরের পর বছর তাঁর কাছাকাছিই নয়, বরং একান্ত পাশেই থেকেছেন। তন্মধ্যে একজন স্নেহভাজন মওলভী মুহাম্মাদ ছানী, মুহাম্মাদ রাবে ও মুহাম্মাদ ওয়াযেহ সাল্লামাহুম-এর আম্মা আমাতুল আযীয সাহেবা যিনি নিজে তাঁর পৌত্র-পৌত্রীসহ সর্বদা তাঁর খেদমতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। অপর বোন যিনি মাশাআল্লাহ নিজে একজন লেখিকা ও কবিও বটেন, আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা, সম্পাদক, রেযওয়ান (মহিলা মাসিক) এবং "যাদে সফর" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার, আম্মার খেদমত ও সাহচর্য লাভের সর্বাধিক সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচে' বড় ব্রত ও ধ্যান-জ্ঞানই ছিল আম্মার খেদমত করা, তাঁর দেখাশোনা এবং অসুস্থ হলে সেবা করা। আর তিনিই সবচে' বেশী সময়, বলা চলে দীর্ঘকাল যাবত অব্যাহতভাবে খেদমতের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই এ ব্যাপারে সর্বাধিক ভাগ্যবতী ছিলেন।

ইসলামের বিজয় ও দীনের বিস্তার দেখতে আগ্রহী

বয়স হওয়া সত্ত্বেও অনুভূতি ও শ্রবণশক্তির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয়নি। দিল ও দিমাগ পুরোপুরি সুস্থ ও সক্রিয় ছিল। কিছু কিছু নতুন কথা ভুলে যেতেন বটে এবং যাদের নতুন আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিল তাদের নামও কখনও কখনও ভুলে যেতেন, কিন্তু পুরনো লোকদের কথা তাঁর খুব মনে থাকত এবং কোন কোন সময় এমন সব ছোট ছোট ও পুরনো কথা ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিতেন যে, আমরা বিস্ময় বোধ করতাম। এটা বিভিন্ন আমল ও ওজীফার ভেতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করার বরকতে জীবনের শেষ অবধি তাঁর অনুভূতি যথাযথ ছিল এবং তাঁর দিল-দিমাগ একেবারে স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি।

এ সময়ও তিনি ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য এবং দীনের বিস্তার দেখতে সীমাহীন আগ্রহী ছিলেন। এ ধরনের প্রতিটি সংবাদেই তাঁর স্নায়ু সক্রিয় হয়ে উঠত এবং তিনি তাঁর শোক-দুঃখ ভুলে যেতেন। দীনের মর্যাদা ও এর বিজয় দেখতে প্রবল আগ্রহ তাঁর মত অনেক ভাল ভাল পুরুষের মধ্যেও দেখিনি। অনুক্ষণ এরই ধ্যান-খেয়াল এবং সর্বদা এরই চিন্তা-ভাবনার মাঝে তিনি ডুবে থাকতেন। এ ব্যাপারে কখনো কখনো তাঁর মধ্যে তাঁর প্রথম শায়খ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র)-এর ঝলক দেখতে পাওয়া যেত। মাঝেমধ্যে তিনি বড় বেচঈন হয়ে পড়তেন আর এসময় লিখতে পারতেন না- স্নেহভাজন মুহাম্মাদ ছানীর মেয়ে কিংবা বোনকে দিয়ে লেখাতেন। ইসলামের দুশমন এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে যারা হেনস্থা করতে চাইত সে সম্পর্কে মাঝেমধ্যেই বৈঠকাদিতে আলোচনা হ'ত। তাদেরকে খুবই ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হতেন। আমার বিশ্বাস, তিনি তাদের হেদায়াত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ যেমন করতেন, তেমনি বদদো'আও করে থাকবেন।

আমার জন্য তাঁর সবচে' বড় আকাংক্ষা ছিল এই যে, আমার দ্বারা দীন যেন শক্তিশালী হয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। কখনো কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আলী! তোমার হাতে কখনো কেউ কি মুসলমানও হয়েছে? আমি বলতাম, হাঁ, দুই-একজন কলেমা পড়েছে। তিনি বলতেন, আমার আরযু! তোমার হাতে দলে দলে লোক মুসলমান হোক। একদিন তিনি ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। আমার ছোট বোন এতদ্দৃষ্টে বলে ওঠেন যে, আসলে আপনি কি চান বলুন তো? আপনি কি চান যে, আলী নবী হয়ে যাক। তিনি বললেন, আমি কি জানি না যে, নবুওত খতম হয়ে গেছে (বিধায় আর কেউ নবী হবে না)। আমার দিল চায় যে, তার হাতে যেন মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করে এবং

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় ডংকা নিনাদিত হয়।

সুন্নতের অনুসরণ এবং দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা

প্রবল ঘূর্ণি ও ঝঞ্ঝাবাত্যা, এমন কি জোরে বাতাস বইলে কিংবা ঝড় উঠলে, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, বিদ্যুৎ চমক ও মেঘ গর্জন শুরু হলে তিনি ভয় পেতেন এবং ঘাবড়ে যেতেন। এমতাবস্থায় তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এবং দো'আর মধ্যে মশগুল হতেন। এক্ষেত্রেও তিনি নিজের অজ্ঞাতেই একটি সুন্নত অনুসরণ করতেন। বয়স যতই বাড়ছিল এবং দুনিয়ার অবস্থা ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যতই তিনি শুনছিলেন ততই আজও যে বেঁচে আছেন এবং এসব অবস্থা তাঁকে দেখতে হচ্ছে এজন্য তিনি মনে কষ্ট পেতেন ও ভাবতেন। কিন্তু কি করবেন, আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতেন, ধৈর্য ধরতেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। অধিকাংশ সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, আমার জানা ছিল না এসব দেখার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ্র আর কি ইচ্ছা তাও আমার জানা নেই, আর এও জানা নেই আরও কি কি দেখা আমার বাকী রয়েছে। কেয়ামতের নযদিক যেসব ফেতনা দেখা দেবে সে সব থেকে সারা জীবনই ভয় পেতেন। প্রথম জীবনে কেয়ামতের আলামত এবং হাশরের ময়দানে যে সব দৃশ্য দেখা যাবে সে সব সম্পর্কে যা শুনেছিলেন, পড়েছিলেন তা তাঁর মনে গেঁথেছিল। এসব ফেতনা থেকে নিজেকে ও নিজের সন্তান- সন্ততিদেরকে কিভাবে হেফাজত করবেন সে সম্পর্কে সব সময় চিন্তা করতেন এবং এজন্য দো'আ করতেন।

জুম'আর দিন খুব পাবন্দীর সাথে সূরা কাহ্ফ পড়ার অভ্যাস ছিল। হাদীস পাকে এ সূরার খুবই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য সূরা কাহ্ফকে সর্বোত্তম প্রতিষেধক বলা হয়েছে। আমাকে এজন্য তাকীদ করতেন এবং মাঝেমধ্যে জিজ্ঞেস করতেন আমি তা নিয়মিত পড়ি কি না।

প্রিয় নেশা ও পেশা

এ সময় তাঁর সবচে' প্রিয় নেশা ও পেশা ছিল কুরআন মজীদের সেই সব রুকূ', আয়াত, আসমাউল-হুসনা (আল্লাহ্র নিরানব্বই সিফতী তথা গুণবাচক নাম) ও দরূদ শরীফ পাঠ যেগুলোর ফযীলত ও বরকত তিনি পেয়ে ছিলেন কিংবা তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল। এসব পড়ে বাচ্চা ও ঘরে লোকদের ওপর দম করতেন, ঝাড়-ফুঁক করতেন। এসব পড়তে তাঁর পৌণে এক ঘন্টা,

এক ঘন্টা লেগে যেত। এরপর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দম করতেন। শেষের দিকে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও নিয়মিত আমলসমূহ আদায় করা, ওজীফা ও দো'আ-দরূদ পাঠের সময় আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কোথা থেকে তিনি শক্তি ফিরে পেতেন এবং তখন তাঁকে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষের মতই দেখাত। একদিনের কথা! আমি আমার ভাগনে ও ভাতিজাদের নিয়ে বসা ছিলাম এবং তিনি পড়ছিলেন। আমরা বললাম যে, এ শক্তি কোত্থা থেকে আসছে, আমাদের জানা নেই। একেই বলে রূহানী শক্তি। দম করা পানি সব সময় রাখা হ'ত এবং কাছের ও দূরের লোকেরা রোগী ও দরকারী লোকদের জন্য এসে নিয়ে যেত এবং এর উপকারিতা ও আল্লাহ-প্রদত্ত আরোগ্য ও বরকত সম্পর্কে আলোচনা করত।

যখনই রোগ-ব্যাধি এসে আম্মার ওপর হামলা করত তখন আমরা মনে করতাম যে, জীবন প্রদীপ এই বুঝি নিভল! শরীরে এক বিন্দু প্রতিরোধ ক্ষমতা কিংবা শক্তি ছিল না। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও যওক এবং কেবল আল্লাহ্র নামের বরকত যার সাহায্যে তিনি তাঁর নিয়মিত আমলসমূহ ও যিক্র-আযকার পূর্ণ পাবন্দীর সঙ্গে আদায় করতেন। যেই দিনটিই অতিবাহিত হ'ত আমরা সেই দিনটিকেই গনীমত মনে করতাম। আমার অবস্থা ছিল এই যে, আমি কোন দিনই তাঁর বয়সের হিসাব করিনি আর কাউকে করতেও দিইনি। আমি মনে করতাম যে, আল্লাহ তা'আলার রহমতের এই ছায়া এবং মায়ের পদতলের এই বেহেশ্ত[১] আমাদের ঘরে যতদিন থাকে তা আল্লাহ পাকেরই অপার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী।

আমার ভূপাল সফর এবং আম্মার আত্মত্যাগ

অবশেষে যে ভয় ছিল এবং যা অলঙ্ঘনীয় সেই মুহূর্তটিই এসে গেল। ১৯৬৮ সালের ২৩শে আগস্ট অসুখের একটা ধাক্কা সামাল দেবার পর আমি বললাম, দিল্লী ও ভূপাল সফরে যাবার জরুরত দেখা দিয়েছে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আপনার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী। আমি যেতে পারব না বলে আমার ওযরের কথা জানিয়ে দিল্লীতে পত্রও দিয়েছিলাম। কিন্তু আম্মার তবিয়ত সুস্থ দেখে বিষয়টি আম্মাকে জানানোটাই সমীচীন মনে করলাম। আম্মার জন্য এ ছিল এক বিরাট মুজাহাদা। কিন্তু তিনি সব কিছু সামলে নিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে যেই কাজের জন্য পয়দা করেছেন তার জন্যই যাও। কিন্তু কবে নাগাদ ফিরবে? আমি

১. "মায়ের পদতলেই বেহেশত" এই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বললাম, আগামী জুমু'আ পর্যন্ত অবশ্যই ফিরতে চেষ্টা করব। কোন কারণে সম্ভব না হলে শনিবারের অন্যথা হবে না (এদিনই তিনি ইনতিকাল করেন)। তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে যাও। যাবার সময় তিনি আমাকে নিয়মমাফিক বিদায় দিলেন এবং কুরআন শরীফের আয়াত ও দো'আ মাছুরা পড়লেন।

মৃত্যুশয্যায় ও একটি মুবারক স্বপ্ন

২৮শে আগস্ট ভোরে স্নেহভাজন মুহাম্মাদ ছানীর টেলিগ্রাম ভূপালে বসে পেলাম যে, নানী সাহেবার তবিয়ত ভাল নয়। আপনি সত্বর ফিরে আসুন। যেই পেরেশানীর ভেতর দিয়ে আমাকে সেখান থেকে ফিরতে হয় আল্লাহ যেন সেই রূপ পেরেশানীর সম্মুখীন আর কখনো না করেন। আমার সবচে' বড় আকাংক্ষা ছিল এই যে, আমি যেন জীবিতাবস্থায় তাঁকে পাই। ভাইজানের দাফনকার্যে শরীক না হতে পারার ক্ষত আমার সারা জীবন শুকাবে না। মৃত্যু অবধারিত। কোন না কোন দিন তা এসে দেখা দেবেই। এটা রদ হবার নয়। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ যে, ২৯শে আগস্ট ভোরে রায়বেরেলীতে পৌঁছুলাম। জানতে পারলাম, আমার রওয়ানা হবার একদিন পর রাত্রে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠেন এবং পেশাবের জন্য তাঁকে চৌকির ওপর বসানো হয় তখন অন্ধকারে ও ঘুমের ঘোরে ঠাওর করতে না পেরে তাঁর হাত ছেড়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় তিনি পড়ে যান এবং গলার হাড়ে আঘাত পান।

পরবর্তী টেলিগ্রামে তিনি ভুপাল থেকে আমার রওয়ানা হবার খবর জেনে ছিলেন এবং খুবই খুশী হয়েছিলেন। আমি উপস্থিত হতেই তিনি বলেন, আমার অর্ধেক শক্তি ফিরে এসেছে। সালাম করলাম। তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং আমাকে বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার শরীরের প্রতিটি পশম থেকে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা বের হচ্ছে এবং আমি এক অদ্ভুত স্বাদ ও আমেজ অনুভব করছি। আমি শুনে বললাম যে, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, খুবই বরকতময় স্বপ্ন। যাই হোক, জুমুআর দিন বেশ ভালই কাটল। কিন্তু হাড়ের ব্যথাটাই বেশী ছিল।

আখেরাতের যাত্রা

শনিবার রাতটা অস্থিরতার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হল। জোহরের নামায হুঁশের সাথেই আদায় করলেন এবং কর গুণে যিক্‌র আরম্ভ করলেন। এরপরই আখেরাতের যাত্রার মনযিল শুরু হ'ল। তিনি তাঁর মরহুমা বোনের নাম নিয়ে

বললেন, তারা লাখনৌ এসে গেছে। এর পরপরই মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হ'ল। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ, আল্লাহ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। এই আওয়াজ বন্ধ হতেই আমরা বুঝতে পারলাম তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে তাঁর পরম স্রষ্টা খালিক-মালিকের দরবারে পৌঁছে গেছেন যাঁর নাম তিনি জীবনভর নিয়েছেন এবং যাঁর অপার করুণা-সিন্ধুর দরজার কড়া নেড়েছেন।

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ *

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (সূরা ফজর ২৭-৩০ আয়াত)।

পরের দিন রবিবার (৭ই জুমাদা'ল-উখরা, ১৩৮৮ হি./১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খৃ.) আলেম-উলামা, বুযুর্গ, ছাত্র ও তাবলীগী জামা'আতের লোকদের এক বিরাট সমাবেশে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আব্বা মওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (র)-এর পাশে এবং শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ্ 'আলামুল্লাহ (র)-র সহধর্মিণীর পায়ের দিকে তাঁকে দাফন করা হয়। পুরো ৪৭ বছর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের পর তাঁর সুযোগ্য স্বামী ও জীবন-সঙ্গীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। এক বিস্ময়কর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় যে, আব্বার ইনতিকালও জুমাদা'ল-উখরা (১৩৪১ হি.) মাসেই হয়েছিল।

দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে অসংখ্য শোকবার্তা এসে পৌঁছে, যেসব বার্তায় আম্মার জন্য দো'আ, মাগফিরাত ও ঈসালে ছওয়াবের খবর ছিল। অধিকন্তু বুযর্গানে দীন, সমকালীন মাশায়েখ ইজাম এবং আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের শোকবাণী থেকে আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর কবূলিয়তের আশা জন্মে।

যে সমস্ত নারী-পুরুষ এই লেখাটি পড়বেন তাদের খেদমতে বিনীত নিবেদন এই যে, তারা যেন মরহুমার জন্য দো'আ মাগফিরাত ও ঈসালে ছওয়াব করেন। কেননা দুনিয়াত্যাগী মুসাফিরের জন্য এর প্রয়োজন সর্বাধিক এবং এতেই তাদের সন্তুষ্টি ও ছোটবড় সকলেই এর মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী।

জীবনের শেষ দিনগুলো

মওলভী মুহাম্মাদ ছানী হাসানী

নানীজান (সাইয়েদা খায়রুন নেসা) জীবনের শেষ বছরগুলোতে একেবারেই মা'যূর হয়ে গিয়েছিলেন। চোখে কিছুই দেখতে পেতেন না, কেবল আলো বুঝতে পারতেন এবং হাল্কা ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হ'ত। কিন্তু দিমাগ ও স্মৃতিশক্তি পুরোপুরিই সচল ও সক্রিয় ছিল। পায়ে একেবারেই জোর পেতেন না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন কিংবা কঠিন কোন দরকারে কোথাও যাওয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দিলে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে হ'ত। এরূপ দুর্বলতা, টলটলায়মান ও বার্ধক্য অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর বয়স নব্বই অতিক্রম করে গিয়েছিল। যিক্‌রে ইলাহী, তেলাওয়াত-ই কুরআন পাক ও নফল ইবাদত-বন্দেগীর তিনি খুবই ইহতিমাম করতেন। তাঁর কাছে খান্দানের মহিলারা, মেয়েরা ও আত্মীয়-বান্ধব বরাবর যাওয়া-আসা করত এবং তাঁর খেদমতে বসে বরকত ও কল্যাণ লাভ করত।

যতটা জানি এবং যতদূর দেখেছি, জীবনের শেষ দিবারাত্রিগুলো, কয়েক ঘন্টা ব্যতিরেকে যা ঘুমিয়ে কাটাতেন, এমন একটি মুহূর্ত ছিল না যা আল্লাহ্‌র স্মরণ, কিংবা দীনী কথাবার্তা বলা বা শোনা ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। তিনি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ্‌র সমীপে যেই আর্জি পেশ করেছিলেন এবং যেই দো'আ করেছিলেন আল্লাহপাক তা পুরোপুরিই কবুল করেছিলেন। তিনি কতটা আবেগ নিয়ে নিবেদন পেশ করেছিলেন ঃ

جینے کی تمنا ہے نہ مرنے کا مجھے غم
ہے فکر تو یہ ہے تجھے بھولوں نہ کسی دم
چپ ہو نہ زبان میری تری حمد وثناء میں
فرق آنے نہ پائے رہِ تسلیم ورضا میں
جب تک کہ رہوں زندہ تری الفت کا بھروں دم
بھولوں نہ تجھے میں مجھے رکھ یاد تو ہردم

করি না বাঁচার আশা
না করি মরণে কোন ভয়,
তোমাকে না যেন ভুলি
এই শুধু আমার মনে রয়
রসনা না যেন থামে

তোমার প্রশংসা গীতি গানে,
লুটাতে চরণে তোমার,
না যেন শ্রান্তি আসে প্রাণে।
যতদিন বেঁচে থাকব
তোমার প্রেমে ডুবে রব
না যেন তোমাকে ভুলি
তোমারই স্মরণে যেন থাকি।

অতঃপর তাই হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত, তাঁর প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত, ঐশী প্রেম, যিক্‌র ও ইবাদত-বন্দেগী তো তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখে বিশ্বাস হ'ত না যে, তিনি এত দুর্বল ও নির্জীব হওয়া সত্ত্বেও কী করে তাঁর দৈনন্দিন নিয়মিত আমলসমূহ পূরা করতেন। ঠিক আগের মতই বসে বিস্তারিতভাবে সবাইকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং প্রত্যেককেই কয়েকবার ঝাড়-ফুঁক করতেন। সব সময় তসবীহ্‌মালা তাঁর হাতেই থাকত এবং মুখে থাকত আল্লাহ্‌র যিক্‌র। কেউ কাছে এসে বসলে খুশী হতেন, তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। দো'আ চাইলে তক্ষুণি দো'আ করা শুরু করতেন।

শেষের দিকে মুনাজাত শোনার আগ্রহ খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনে শত শত মুনাজাত বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি এও ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমি কবে ও কখন কোন্ মুনাজাত বলেছিলাম। যখন তাঁর সামনে বিস্মৃত কোন মুনাজাত উচ্চারণ করা হ'ত তখন তিনি খুবই খুশী হতেন।

শেষে তাঁর পাকস্থলী নিস্তেজ ও নিষ্ক্রীয় হয়ে গিয়েছিল। শরীরে রক্ত ছিল না বললেই চলে। দুর্বলতা চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে। অসুস্থতা সামান্য বৃদ্ধি পেলেই তিনি পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে একবার পাকস্থলী খারাপ হলে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তদ্দৃষ্টে সবাই পেরেশান হয়ে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে সত্বরই তিনি চোখ মেলে তাকান এবং কিছুটা চেতনা ফিরে পান। ইতিমধ্যে মামূজীর (মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী) ভূপাল সফর সামনে এসে হাজির হয়। তিনি দোটানায় পড়ে যান। বুঝে উঠতে পারছিলেন না এসময় তিনি সফরে যাবেন কি না? যাওয়া উচিৎ কি না? নানীজান বয়সের এমন এক মনযিলে এসে উপনীত হয়েছিলেন যে, সব সময় আশংকা ছিল- না জানি কখন কি হয়। এজন্য মামূজীর কয়েক ঘন্টার অনুপস্থিতিও সবাই অনুভব করত। এই দোটানার ভেতর মামূজী নিজেই নানীজানের খেদমতে গিয়ে হাজির হন এবং সফর সম্পর্কে বলেন। তিনি এও

বলেন, আমি এব্যাপারে আমাকে আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনি বিন্দুমাত্র অমত হলেও এ সফর হবে না। এখনও দু'দিন বাকী আছে। যা বলবেন তাই হবে। আম্মা-বী বললেন, আলী! দীনী কাজে আমি তোমাকে বাধা দেবার পক্ষপাতী নই। যাও, আল্লাহ্ই তোমাকে হেফাজত করবেন, সাহায্য করবেন।

আমার মেয়ে উমামা প্রায় তাঁর খেদমতে থাকত, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করত ও প্রয়োজনীয় ফাই-ফরমায়েশ খাটত। সে ছিল খুবই মিশুক প্রকৃতির। নানীজান তাকে কাছে বসিয়ে মুনাজাত শোনাতে বলতেন। কয়েকটি মুনাজাত তিনি বিশেষভাবে তার থেকে শুনেছিলেন এবং শুনে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি আপনারাও শুনুন ঃ

یا الہی اب مجھے دیدار احمد ہونصیب
کر دعا مقبول میری نام ہے تیرا مجیب
خواب میں مجھکو نظر آئے تو میں اس دم کہوں
ہے یہی پیارا محمد جو خدا کا ہے حبیب

ইয়া এলাহী! আমার যেন
দীদার নবীজীর হয় নসীব,
আমার দোয়া কবুল করো
তোমার নাম তো মুজীব।[১]
স্বপ্নে যখন দেখা পাবো
তখন যেন উঠি বলে,
মুহাম্মদ পিয়ারা আল্লাহ্র
এই যে দেখি খোদার হাবীব!

এবং যখন তিনি এই মুনাজাত শুনলেন তখন প্রায় আত্মহারা হয়ে যান ও মুচকি হাসেন ঃ

ہوں اسی دم یا الہی میں فدائے مصطفی
روح میری جنت الفردوس کے پہونچے قریب
آئیں حوریں میرے لینے کیلئے فردوس سے
شور ہو عالم میں یہ ہرسوکہ کیا جاگے نصیب

হই যেন নবীজীর পাগল
আমার আত্মার হয় যেন গো
জান্নাতুল ফেরদৌস করীব।[২]
হুরপরীরা আমাকে নিতে

টিকা - ১. মুজীব – দোয়া কবুলকারী বা ডাকে সাড়া দানকারী। ২. করীব– নিকট।

জান্নাত থেকে যেন নামে,
দুনিয়া জোড়া আওয়াজ ওঠে–
কী অপূর্ব খোশ্-নসীব!

তদীয় পুত্র আমার শ্রদ্ধেয় মামূজী মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহেব নদভীর সঙ্গে তাঁর যেই স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা কারুর অজানা নয়। তাঁর নিরাপত্তা, দীনের খেদমত ও কবূলিয়াতের জন্য তিনি সদা সর্বদাই দো'আ করেছেন ও করতে থাকতেন। পুত্রের জন্য তিনি কাব্যে যেই মুনাজাত লিখেছিলেন তা তাঁর সামনে পাঠ করা হয় যার কতিপয় পংক্তি এই ঃ

رہے زندہ باقی جہاں میں علی + رہے تیرے حفظ وآماں میں علی
ہو آباد کون ومکان میں علی + ہو سر سبز باغ جہاں میں علی
علی سے ہو روشن چراغ جہاں + علی سے ہوسر سبز باغ جہاں

আলী যেন জিন্দা থাকে জাহানে,
আলী থাকুক তোমার হিফ্য[১] ও আমানে[২]
আলী যেন আবাদ হয় সবখানে,
আলী যেন ফুটে ওঠে জাহানে।
আলী দ্বারা রওশন হোক বাগে-জাহাঁ
আলী দ্বারা সবুজ শ্যামল হোক জাহাঁ

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা যার ভেতর সর্বপ্রকার দো'আ ও মুনাজাত রয়েছে। যখন তাঁর নাতনী উল্লিখিত কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি পাঠ করল ঃ

تو حافظ ہے اس کا توہی ہے رقیب
بلا کوئی آوے نہ اس کے قریب
دعا سن لے میری تورب مجیب
الٰہی علی کو توکر خوش نصیب
علی سے بڑھے خاندان علی
علی سے نمایان ہو شان علی

তুমিই তার রক্ষাকারী নিগাহ্বান
আপদ যেন না আসে তার কাছে।
দো'আ শোন আমার তুমি রব্বে মুজীব!
এলাহী! আলীকে করো খোশনসীব।
আলী দ্বারা বাড়ে যেন বংশ আলীর

টীকা– ১. হেফ্য-মানে হেফাযত। ২. আমান মানে-নিরাপত্তায়।

আলী দ্বারা বাড়ুক আল্লাহ্ শান আলীর।

তখন তাঁর চেহারা আনন্দে ও খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আমীন, আমীন বলতে লাগলেন। এই কবিতারই একটি পংক্তি কতটা দরদ ও ব্যথায় পূর্ণ তা আপনিও একটু দেখুন ঃ

یہ دل آزمائش کے قابل نہیں ہے
کہ بسمل ترا اب وہ بسمل نہیں ہے

এই দিল নয় আর যোগ্য তোমার শক্ত পরীক্ষার
বিসমিল[১] নয় আর পূর্বের সে বিসমিল বে-কারার।

এরপর পাঠিকা তাঁরই কথিত অপর মুনাজাত পাঠ করল যার প্রথম অংশ নিম্নরূপ ঃ

نہوں کیونکر تصدق اس خداکے
میں ہوں قربان اس شان عطاکے
تسلی دی مجھے اس نے اسی دم
گئ در پرمیں جب اس کبریا کے
نہیں تھی میں کسی قابل جہاں میں
مگر سب کچھ دیا اس نے بلاکے
تمنائے دلی میری یہی ہے
اٹھا لے رنج سے غم سے بچاکے
خوشی میری رہی باقی جہاں میں
میں کر جاؤں سفر آرام پاکے

কেমন করে না রাখি বলো বিশ্বাস মহান আল্লায়?
কুরবান আমার প্রাণ তাঁর মহান সত্তায়।
যখনই গিয়েছি আমি তাঁর মহান দর্জায়,
তখনই শান্তিতে মন ভরেছে কানায় কানায়।
যোগ্যতা বলতে কিছু এ বিশ্বে ছিল না আমার,
সকলই দিলেন তিনি সবই দান তাঁরই মহিমার।
গুমরিছে মনে আশা তুলে নাও ব্যথা থেকে দূরে
সুখস্মৃতি থাক আর শান্তি হোক সুগম সফরে।

এই মুনাজাত খতম করার পর এরই পরবর্তী মুনাজাত আবৃত্তি করল যার পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

টীকা ১. বিসমিল-জবাইকৃত, উৎসর্গীকৃত।

تجھ سے گرمیں کہوں نہ حال دل + کس طرح پھر قرار جاں ہووے
کیوں نہ تجھ سے کہوں میں رورو کر + ضبط کیونکر یہ اب فغاں ہووے
دل میں طاقت ہے نہ ہمت ہے + حال دل کس طرح بیاں ہووے
جو ہے مغموم ایک مدت سے + پھر بھلا کیوں نہ نیم جاں ہووے
عفو کراب مری خطاؤں کو + توہی اب مجھ پہ مہر باں ہووے
تیرے لطف وکرم کے صدقے میں + صدمہ و رنج بے نشاں ہووے
تیرے نزدیک کچھ نہیں مشکل + تو جو چاہے نہیں بھی ہاں ہووے
تو جو چاہےگا بس وہی ہوگا + اک طرف گرچہ سب جہاں ہووے
بس رضا پر ترے میں راضی ہوں + حکم تیرا جو کچھ عیاں ہووے
شکر اس کا کرے نہ کیوں بہتر + جوکہ ہر لحظہ مہرباں ہووے

তোমার কাছেই যদি না জানাই মনের বেদনা
কেমন করে পাবে শান্তিপাগল অশান্ত এ মন?
কেঁদে কেঁদে যদি খোদা না করব ব্যথা নিবেদন,
বুক ভরা দুঃখ কি করে হবে উপশম?
হৃদয়ে শক্তি নেই– সাহস তো নেই একদম,
কী করে বুকের ব্যথা তোমার কাছে করব বর্ণনা?
বিরহ কাতর মন শোকে শোকে হয়ে গেছে ক্ষয়
ত্রুটিগুলো হে দয়াল নিজগুণে করো হে মোচন!
তোমার দয়ার দানে ব্যথা সব হতে পারে দূর?
অসম্ভব সম্ভবো তুমি 'না'-র মাঝে থাকে 'হাঁ'-র সুর।
তুমি যা চাও তাই ঘটবে তা' অতি বিলক্ষণ,
কী সাধ্য বিশ্বের সবাই মিলে করবে তা কখনো খণ্ডন?
তোমার তুষ্টিতে তুষ্ট মোর মন
বেহ্তর কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরি হে দয়াল তোমার চরণ!

মুনাজাত শেষ হলে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আমি কি এমন মুনাজাত বলেছি? এরপর তিনি তদীয় কন্যা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবাকে বললেন, "আয়েশা! আমার খুবই প্রশান্তি রয়েছে যে, আমার যা কিছু চাইবার ছিল চেয়েছি।"

জুমু'আর দিন শ্রদ্ধেয় মামূজী (মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহেব নদভী) ভূপালের পথে দিল্লী সফর করেন। নানীজান রাত্রিকালীন সফরের কথা শুনলে সব সময় ঘাবড়ে যেতেন। লাখনৌ থেকে দিল্লীর সফর সব সময় রাত্রেই হ'ত।

পরদিন শনিবার তিনি আমাকে বলতে লাগলেন ঃ

"আলীর সফরের ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তায় আছি। রাত্রিবেলা দিল্লীতে গেছে। না জানি রাত কেমন কেটেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে ভালই ভালই পৌঁছে দেন এবং সহীহ-সালামতে ফিরিয়ে আনেন।"

আমি বললাম ঃ আপনি পেরেশান হবেন না এক বিন্দুও। আল্লাহ চাহে তো সফর খুবই আরামের সাথে হবে। শোবার সিট পাওয়া গেছে। সফর খুবই আরামপ্রদ হবে। মনে করুন, তিনি তাঁর নিজের পালংয়ের ওপরই শুয়ে আছেন। একথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন এবং মাশাআল্লাহ বললেন।

সম্ভবত ঐ রাত্রেই কিংবা এর আগের কোন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং সকাল বেলা তাঁর মেয়েকে ডেকে বললেন, আজ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, "আমার শরীরের প্রতিটি লোম থেকে আল্লাহ্র হাম্‌দ তথা প্রশংসা গীতি বের হচ্ছে।"

রবিবারের রাত গত হয়ে ভোর হ'ল। আমি ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন নানীজানের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমার খালা (আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা) আমাকে বললেন, মুহাম্মাদ ছানী! আম্মা আজ পড়ে গিয়েছিলেন। 'কখন' জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, এই অল্প কিছুক্ষণ আগে। আমি বললাম, এখনকার অবস্থা কেমন? তিনি বললেন, এখন সম্ভবত ঘুমিয়ে গেছেন। নামাযের পর এসে আবার তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম। জানতে পারলাম, তিনি নামায পড়ে শুয়ে পড়েছেন।

কয়েক ঘন্টা পর তিনি কষ্ট বোধ করেন। কাঁধে বেশ ব্যথা ছিল। আমি নানীজানকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। আমার আশংকা হয়, হাড়ে আঘাত লেগেছে। বিভিন্ন রকমের ঔষধ মালিশ করা হ'ল ও খাওয়ানো হ'ল। সাময়িক উপশম হ'ল ব্যথার। শেষে পরামর্শক্রমে সন্ধ্যার দিকে ডাক্তার ডাকা হ'ল। তিনি দেখে শুনে বললেন, হাড্ডি স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। অন্যদিকে শারীরিক দুর্বলতার যা অবস্থা তাতে এটা ঠিক করাও মুশকিল। ঔষধের সাহায্যে কাজ চলুক।

তৃতীয় দিন তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে অন্য কামরায় স্থানান্তরিত করা হ'ল যেখানে তিনি আগে স্থায়ীভাবে থাকতেন। কামরাটি ছিল বেশ প্রশস্ত ও আলোময়। স্থানান্তরিত করতে গিয়ে তাঁর দুর্বলতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর শরীরের স্পন্দন (Pulse) কমযোর হয়ে যায়। ঠিক তন্মুহূর্তে মামুজীকে দ্রুত ফিরে আসার জন্য টেলিগ্রাম করা হয় এবং নানীজানকেও এ খবর দেওয়া হয়।

তিনি এই খবর জেনে খুবই খুশী হন ও মাশাআল্লাহ্ বলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শান্তি ফিরে পেয়েছেন। পরদিন মামুজী আসছেন– এই মর্মে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। টেলিগ্রামের খবর দিতেই তাঁর মন আনন্দে ভরে যায় এবং বলতে থাকেন, স্বাদ ফিরে এসেছে। বুধবার ভোরে মামুজী এসে পৌছেন। মামুজীর সঙ্গে মিলিত হতেই মনে হ'ল তিনি যেন তাঁর লুপ্ত শক্তি ফিরে পেয়েছেন, ভুলে গিয়েছেন তাঁর সকল কষ্ট ও ব্যথা। আমরা মাতা-পুত্রের এই সাক্ষাতের দৃশ্যকে এমন এক নি'মত জ্ঞান করলাম বাহ্যত যার কোন আশাই ছিল না।

জুমু'আ ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাতটি তিনি খুবই অস্থিরতার মধ্যে কাটান। এতদ্‌সত্ত্বেও নামাযের ইহতিমাম এবং তসবীহ্ পাঠের নিয়মিত আমল অব্যাহত ছিল। দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হাড়ের ব্যথা ও কষ্ট ছিল বেশ। কিন্তু তারপরও কোন সময় এমন কোন কথা তিনি বলেননি যদ্দ্বারা কোনরূপ অভিযোগ কিংবা অধৈর্যের সামান্যতম আঁচ পাওয়া যায়। এই কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে, যেই কষ্ট ও যন্ত্রণায় যুবকেরা পর্যন্ত চীৎকার করে ওঠে, ৯৩ বছরের একজন বৃদ্ধা তার মধ্যে আপাদমস্তক ধৈর্য-স্থৈর্য ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক সেজে স্থির ও অচঞ্চল বসেছিলেন। কখনও কিছু উচ্চারিত হলে কেবল আল্লাহ্‌র যিক্‌র উচ্চারিত হচ্ছিল। অবশ্য কেবল একবারই খুব কষ্টে আর না পেরে বেচঈন অবস্থায় এতটুকু বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করে দাও।"

জীবনের সেই শেষ রাত্রে যখন তাঁর বেচঈনী ও অস্থিরতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল তখন তাঁর রায়হানা নামক এক নাতনী তাঁকে বলল যে, তিনি বললে সে কোন একটি মুনাজাত কিংবা না'ত শোনাতে পারে। একথা বলতেই তিনি বলে ওঠেন, অবশ্যই শোনাবে। অনুমতি মিলতেই রায়হানা নিম্নোক্ত মুনাজাতটি শোনায় ঃ

زباں میں یا الٰہی یہ اَثردے + کہ جو چاہوں میں تجھ سے تو وہ کردے
رہے باقی کوئی حسرت نہ یارب + گل مقصود سے دامن کو بھردے
تصدق میں حبیب مصطفی کے + مری سب مشکلیں آساں کردے
مسرت کی گھڑی دکھلا دے یا رب + غم ورنج والم سب دور کردے
عطا پر عطا رحمت پہ رحمت + مرا گھر نعمت ودولت سے بھردے
تو اپنی خاص رحمت سے اَلٰہی + خوشی شام وسحر اٹھوں پہر دے
ترا ملنا بہت آساں ہوجائے + اگر اپنا کرم اک آں کردے
رہے زندہ مری اولاد یارب + ترقی رزق میں شام وسحر دے
اگر زندہ رہوں میں تو رہوں خوش + اگر مر جاؤں تو جنت میں گھر دے

সেই শাহানশাহ্‌র দান পেয়ে আজ খুশী আমার
আচল ভরে কুড়িয়ে পাই ঘরে ফেরার।

এই মুনাজাতটি বেশ দীর্ঘ। এতে আম্বিয়া-ই কিরামের ওসীলা ও মাধ্যম, হযরত ইউসুফ (আ)-এর কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ, হযরত আইয়ূব (আ)-এর কষ্টভোগ ও এর থেকে মুক্তি, হযরত ইউনুস (আ)-এর মাছের পেটে গমন ও সেখান থেকে বেরিয়ে আসা, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিমিত্ত আগুনের শীতল ও শান্তিদায়ক হওয়া বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র এই অব্যাহত অনুগ্রহ ও বদান্যতার দোহাই দিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের আবেদন জানিয়েছেন। উল্লিখিত কবিতারই একটি অংশ এইঃ

اب توخوش ہوجا الٰہی مصطفی کے واسطے
باب رحمت کھول دے خیر النساءکے واسطے

এখন সদয় হও এলাহী মোস্তফারই ওয়াস্তে
রহমতের দ্বার দাও খুলে দাও খায়রুন্নেসার ওয়াস্তে।

তাঁর আসল নাম ছিল 'খায়রুঠ নেসা' এবং কবিনাম ছিল "বেহতর"। উল্লিখিত মুনাজাতের কয়েকটি ছত্র পাঠ করেই সে কোন কাজে চলে গেলে তিনি মুনাজাতের বাকী অংশ সমাপ্ত করার জন্য তাকীদ দিতে থাকেন। তখন উমামা এর সমাপ্তি টানে। চলুন, আমরা এর আরও কিছু পংক্তি শুনি ঃ

یا الٰہی اب جہاں میں مبتلائے غم نہ کر
دل مرا پر غم نہ کر اور چشم میری نم نہ کر
فکر غم سے ہوں میں لاغر پشت میری خم نہ کر
جو نگاہ رحم ہے مجھ پر تری وہ کم نہ کر
دے رہائی قید غم سے اے خدا اب تومجھے
بس بڑی امید سے میں نے پکارا ہے تجھے

ইয়া এলাহী! আর করো না দুঃখবন্দী এই ভুবনে
আর দিও না দুশ্চিন্তা দুঃখ অশ্রু নীর এই নয়নে!
আর করো না পিঠটি বাঁকা দুঃখভার চাপিয়ে দিয়ে
কম করো না এই অভাগীর দিকে চাওয়া সদয় মনে।
দুঃখ ব্যথার কয়েদ থেকে এবার খোদা মুক্তি দাও
ডাক্‌ছি খোদা এবার তোমার বড়ই আশা নিয়ে মনে।

রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। ফজরের নামায পড়লেন। শরীর কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। চাশ্‌তের ওয়াক্‌ত হ'ল। তিনি কাউকে কিছু না বলে তায়াম্মুমের জন্য মাটি

جہاں میں جب تک زندہ رہے بہتر + سرا پاخوبیوں سے اس کو بھر دے

ইয়া এলাহী! যবানে আমার আছর এতই দাও ভরে দাও।
যা-ই মাগি না তোমার কাছে, তাই যেন গো দাও করে দাও!
মনের কোনো সাধই যেন অপূর্ণ না রয় আমার,
তোমার দানে আঁচল ভরে সব পেয়েছি-র ভাব করে দাও?
মোস্তফারই সদ্‌কাতে রবো সব মুশকিলে আসান কর!
দুঃখ ব্যথা দূর করে খোশ্ আনন্দে মন ভরে দাও!
দানের পর দান দিয়ে আর রহমত ঝরিয়ে অঝোর ধারায়
রহমত আর নিয়ামত দিয়ে প্রভু আমার ঘর ভরে দাও!
খাস রহ্‌মতের ভাণ্ডার খুলে দাও আমাকে আয় এলাহী!
সকাল বিকাল অষ্টপ্রহর রহমত তোমার বর্ষিয়ে দাও!
তোমায় পাওয়া সহজ করে দিতে পার তুমিই খোদা
দয়া যদি করোই খোদা এক নিমেষে তা-ই করে দাও!
আওলাদ যদি জিন্দা থাকে রিযিক দৌলত তরক্কী দাও
জিন্দা রাখলে খুশী রেখো মারলে জান্নাতে দিও!
'বেহ্‌তর' যাবৎ এই ভুবনের আলো হাওয়ায় বেঁচে থাকে
সুকৃতি ও সৌন্দর্যে তার 'মাথা থেকে পা' ভরে দাও!

এই মুনাজাতের পর পাঠিকা নিম্নোদ্ধৃত আরেকটি মুনাজাত শুরু করল। তিনি শুনছিলেন আর আমীন! আমীন! বলে চলছিলেন। তিনি কি তখন জানতেন যে, পরদিনই তাঁর রব প্রভু প্রতিপালক "যদি মারা যাই তবে জান্নাতে আমাকে বাসগৃহ দিও"-র মুনাজাত কবুল করতে যাচ্ছেন?

کون سی سرکار ہے جس کا ہے سب کو آسرا +
کون سا دربار ہے جس میں ہے ہرکوئی کھڑا
کون سا وہ شاہ ہے جس کا ہے ہرکوئی گدا +
کون سا درہے نہ جس در سے کوئی خالی پھرا
آج اسی سرکار سے میں بھی تو پاکر شاد ہوں
آج اسی دربارسے میں بھی تو خوش ہو کر پھروں

কোন্ সে সত্তা যার কাছে সবার ঠাঁই
কোন্ সে দুয়ার যেখানে কারো বারণ নাই?
কোন্ সে বাদশাহ্ সকলেই যার করীব
কোন্ দরজায় খালি হাতে ফেরৎ নাই?

হাতড়াতে লাগলেন যা তাঁর মাথার কাছেই থাকত। কেউ বলল, এখনও জোহরের ওয়াক্ত হয়নি। কিন্তু তিনি কিছু না বলে এদিক-ওদিক হাতড়াতেই লাগলেন। তাঁকে তায়াম্মুম করার জন্য তখন মাটি এগিয়ে দেওয়া হল। তিনি পূর্ণ ইহতিমামের সঙ্গে তায়াম্মুম করলেন। এ সময় তিনি সামান্য নেতিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি দু' রাকআত চাশ্তের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার নেতিয়ে পড়লেন।

জোহরের ওয়াক্ত হলে মামুজী (মাওলানা আলী মিঞা) আমার খালাকে বললেন, আম্মাকে নামায পড়িয়ে দিন। নানীজানকে নামায পড়বেন কি না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। তায়াম্মুমের মাটি হাতের কাছে দেওয়া হলে তিনি নিজেই তায়াম্মুম করলেন ও পরিপূর্ণরূপেই তায়াম্মুম করলেন এবং বুকের ওপর ডান হাত বেঁধে নিয়ত করলেন (কেননা হাড়ে আঘাত লাগার কারণে তিনি বাম হাত নাড়াচাড়া করতে অক্ষম ছিলেন)। অতঃপর তিনি পুরো চার রাক'আত নামাযই আদায় করলেন। জানি না, নামাযের সময় এতটা হুঁশ তিনি কিভাবে পেলেন। তিনি বহু বছর আগে জীবনের শেষ মুহূর্তের নিম্নোক্ত মুনাজাতটি করেছিলেন ঃ

اس گھڑی لب پر الٰہی مرے توہی تو ہو
بے خودی میں بھی رہے ہوش بس اتنا باقی

সেই লহমায় আয় এলাহী! তুমিই থেকো মোর যবানে
হুঁশ হারিয়ে বেহুঁশ হলেও কথাটুকু রেখো মনে।

আমরা সবই নামায পড়তে চলে গেলাম। মামুজী আমাকে বললেন, এখন কাছাকাছিই থেকো। নামায শেষে আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে এলাম। তিনি বেহুঁশ প্রায় অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর ডান হাত বারবার কি যেন খুঁজে ফিরছিল। বুঝতে পারলাম, তিনি তসবীহ তালাশ করছেন। কেননা সব সময় তাঁর হাতে তসবীহমালা থাকত। শেষে এই ভেবে তাঁর হাত থেকে তসবীহ মালাটি সরিয়ে রাখা হয়েছিল যে, তসবীহমালা জপের জন্য তাঁর কষ্ট হবে। চিরদিনের অভ্যাসের দরুন তিনি এরূপ করছিলেন এবং হাতের আঙুল একে অপরের সঙ্গে গোলাকারেই স্পর্শ করছিল যেমনটি তসবীহ আদায়ের সময় হয়ে থাকে।

বেলা তিনটার সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং নীরবতা ভঙ্গ হয়। তিনি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকেন এবং শ্বাসের সঙ্গে যিক্‌র করতে থাকেন। এই যিক্‌রের শব্দে সকলেই এসে তাঁর পাশে জড়ো হয়। আল্লাহ! আল্লাহ! যিক্‌র

এত জোরে এবং পরিষ্কারভাবে জারী হয় যে, এর আওয়াজ কামরার বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। পৌণে তিন ঘন্টা যাবত লাগাতার এই যিক্‌র করতে থাকেন। আমরা এর আগে আর কখনো এরকম প্রশান্তিময় দৃশ্য দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন আল্লাহ্‌র অবারিত রহমত নাযিল হচ্ছে। সকলের হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছিল। এই বরকতময় দৃশ্য দেখে তাঁরই একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল এবং এর কবূলিয়তের পূর্ণ ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল ঃ

رکھ مجھے اسلام اور ایمان پر ثابت قدم
ساتھ اسانی کے نکلے یا الہی میرا دم
روح میری جس گھڑی ہونے لگے تن سے جدا
ذکر ہو جاری زباں پر ہر گھڑی اور برملا

ইসলাম আর ঈমানের উপর রেখো খোদা অটল আমাকে
বের হবে দমটি যখন মিল্‌তে যাবো তোমার সাথে
যেই দমেতে রূহ্‌টি আমার শরীর ছেড়ে জুদা হবে
যবানেতে যিক্‌র জারী বিশ্ববাসী সাক্ষী রবে।

ہرگھڑی (প্রতি মুহূর্তে) এবং برملا (প্রকাশ্যে, খোলামেলা) শব্দ দু'টো কিভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে চক্ষুষ্মান সকলে তা দেখতে পাচ্ছিল এবং শ্রবণশক্তির অধিকারী প্রতিটি কান তা শুনছিল।

سفر کرنے لگوں جو دم عدم کا
مرے اگے تری جنت کھڑی ہو
زباں پر ہو ترا بس ذکر جاری
کس کی فکر ہو اس دم نہ طاری
الہی دے زباں کو میری طاقت
کروں میں دم بدم ذکر شہادت
خوشی سے لےکے میں ایمان جاؤں
اور ترے احکام پر قربان جاؤں

যেই দমেতে আখেরাতের সফর আমার শুরু হবে
অতি আশা তোমার বেহেশ্‌ত চোখের পরে খাড়া রবে,
সেই দমেতে তোমার যিকির কেবল যেন রয় যবানে
এই দুনিয়ার কোনও কিছুই তখন মনে নাহি রবে।
আয় এলাহী! যবানে আমার সেই না তাকত দিয়ে দেবে,

প্রতি পলে শাহাদত বাণী যবান আমার উচ্চারিবে।
খুশী মনে ঈমান নিয়ে বিদায় হবো বিশ্ব থেকে
তোমারই আহ্‌কামের উপর জীবন আমার কুরবান হবে।

এ ধরনের শত শত কবিতা তাঁর মুনাজাতের গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে যার ভেতর থেকে নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। ঠিক তেমনি তাঁর হস্তলিখিত একটি পাণ্ডুলিপিতে একটি দীর্ঘ দো'আ রয়েছে যার ভেতর দীন ও দুনিয়ার প্রতিটি নে'মতই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছেন এবং পরিশেষে তাঁর মৃত্যু যেন কল্যাণকর হয়, শুভ হয় সেজন্য বিস্তারিতভাবে দো'আ করেছেন ও আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করেছেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো চামচের সাহায্যে তাঁর মুখে যমযমের পানি ফোটা ফোটা করে দেওয়া হচ্ছিল এবং দেওয়া মাত্রই তা গলাধকরণ করছিলেন।

আমরা আসরের নামায পড়তে গেলাম ওয়াক্ত হতেই এবং নামায শেষ হতেই সাথে সাথে ফিরেও এলাম। যিক্‌র অব্যাহত ছিল। খান্দানের অন্যান্য লোকেরা সমবেত হ'ল। ভীড় বাড়তে লাগল এবং লোকে আস্তে আস্তে সূরা ইয়াসীন পড়তে শুরু করল। তালকীন করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি এজন্য যে, তিনি নিজেই যিক্‌র করছিলেন। আমি তিনবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করলাম। এভাবে অনেকেই তিন-চারবার সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করেন। আমার শ্রদ্ধেয় খালাআম্মা আমাতুল্লাহ তাস্‌নীম বলেন, সূরা ইয়াসীন-এর পর আমি নিম্নোক্ত এই দো'আটি বরাবর পড়ে থাকি ঃ

اللهم بارك لى فى الموت وفيما بعد الموت وتب علينا قبل الموت وهون علينا سكرات الموت .

"হে আল্লাহ! আমাকে বরকতময় মৃত্যু দিও এবং মৃত্যুর পর বরকত নাযিল ক'র, মৃত্যুর আগে তওবা নসীব ক'র এবং মৃত্যুযন্ত্রণা আমার জন্য সহজ করে দিও।"

তিনি বলেন, এই দো'আ আমাকে আমার আম্মাই তাঁর এক প্রিয়জনের ইনতিকালের সময় পড়তে বলেছিলেন।

সন্ধ্যা ছ'টা বাজার পনের মিনিট বাকী থাকতে যিক্‌র বন্ধ হয়ে গেল এবং উপস্থিত পরিবেশে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কয়েক সেকেন্ড পরই আমরা জানতে পারলাম, প্রাণবায়ু তাঁর নশ্বর দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজি'উন। জীবনভর ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌রে ইলাহীর মাঝে কঠোরভাবে মগ্ন ধর্মভীরু মহিলা তাঁর মাহবূবে হাকীকীর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান

এবং সারা জীবনের অস্থিরতার পর সুস্থির সত্তায় রূপান্তরিত হন।

جان ہی دے دی جگرنے اج پائے یارپر
عمر بھرکی بے قراری کو قرار آہی گیا

বন্ধুর চরণে 'জিগর' প্রাণই আজ
করেছে কুরবান
আজীবন অস্থিরতার আজ হলো
চির অবসান।

সাধারণত কেউ মারা গেলে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ধরনের ঘাবড়ে যাবার অবস্থা বিরাজ করতে থাকে এবং মৃত্যুর পর মৃতের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এক ধরনের ভীতিকর আতংক ও শোক-দুঃখের পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু এখানে অবস্থা ছিল এর একেবারেই বিপরীত। তৃপ্তি ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই তৃপ্তি ও প্রশান্তির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সবার মনের ওপর ছেয়ে ছিল এবং এই বরকতময় মৃত্যুর ওপর প্রত্যেকেই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। আর এমন মৃত্যুর আকাংক্ষাই দিলে জেগে উঠছিল এবং বিদায়ী এই নেক মহিলার এরকম বরকতময় পারলৌকিক বিদায়যাত্রা ও সৌভাগ্য দৃষ্টে সকলেই ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ছিল এবং তাঁর দো'আ তাঁদেরই কথায় পুরোপুরি কবুল হয়।

ہوں پوری آرزوئیں سب اٹھوں دنیا سے خوش ہوکر
ہو میری خوش نصیبی کا الہی تذکرہ گھر گھر

আরযু আমার পূর্ণ হউক
বিদায় নেবো হৃষ্ট চিত্তে
আমার সৌভাগ্য কথা আলোচিত
মুখর হবে সর্ব-ভুতে।

ইনতিকালের পরপরই লাখনৌ, কানপূর, ফতেহপুর, দিল্লীতে এর খবর জানিয়ে দেয়া হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও সম্পর্কিত লোকেরা রাত্রিবেলাতেই এসে যায়। রাত এমন প্রশান্তিতে অতিবাহিত হয় এবং দিলের ওপর এমন এক অবস্থা ও কাইফিয়াত ছেয়ে ছিল যা বর্ণনাতীত।

রাত দু'টোর সময় ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেলাম, মামুজী (মাওলানা আলী মিঞা) অপর কামরায় তাঁর আম্মারই লিখিত মুনাজাত বড়ই দরদ ও ব্যাকুলতার সঙ্গে পাঠ করছেন। তা কি ছিল আজ আর তা আমার মনে নেই। কিন্তু এমন এক অবস্থায় যখন রাত্রির নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল- তা শোনার পর এক অদ্ভূত অবস্থা ও মিষ্টতা অনুভব করছিলাম। ফজরের আগেই মুর্দাকে গোসল দেওয়া

হয়। সারা জীবন যিনি সুন্নতের প্রতি খেয়াল রেখেছেন, এর প্রতি ইহতিমাম করেছেন, তাঁর গোসলও যেন সুন্নত মুতাবিক হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। নানীজানের অন্যতম কন্যা আমাতুল্লাহ তাসনীম "বেহেশতী যেওর" নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং অপর কন্যা আমার আম্মা যারা গোসল দেন তাদের সঙ্গে শরীক হন এবং প্রতিটি সুন্নতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গোসল দেওয়া হয়। অবশেষে সকাল আটটার সময় শেষবারের মত দেখার পর জানাযা বাইরে নেওয়া হয়। মাঠে তদীয় সাহেবযাদা মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর ইমামমিতে সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। এরপর শুরু হয় খাটিয়া কাঁধে নেবার প্রতিযোগিতা। অত্যধিক ভীড়ের দরুন কয়েকজনের ভাগ্যে কাঁধে নেবার সুযোগ ঘটেনি, তাদের কেবল খাটিয়ার পায়া স্পর্শ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খান্দানের পূর্বপুরুষ হযরত শাহ 'আলামুল্লাহ (র)-র রওযা যেখানে অবস্থিত, যেখানে তাঁর ও তাঁর পরিবারের কয়েকজনের মাযার রয়েছে, যার মধ্যে মরহুমার মহান জীবনসঙ্গী মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই-এর মাযারও আছে, তাঁরই পাশে পূর্বদিকে সকাল সাড়ে আটটার সময় এই পূণ্যবতী মহিলাকে, যাঁর বদৌলতে সমগ্র খান্দানের ওপর কল্যাণ ও বরকত নাযিল হচ্ছিল এবং যাঁর অব্যাহত যিক্র ও ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা প্রতিটি গৃহ রহমতে ইলাহীর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, দাফন করা হয়। লোক সমাগমের আধিক্যের কারণে মাটি দিতে পৌণে এক ঘন্টা সময় লাগে। প্রায় সোয়া নয়টার সময় আমরা দাফন শেষে দো'আ করতে করতে রওযা থেকে বেরিয়ে আসি ঃ

زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر
خوب ترتھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر
مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو ترا
نورسے معمور یہ خاکی شبستان ہو ترا
آسمان تری لحدپر شبنم افشانی کرے
سبزہ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

তোমার জীবন ছিল চন্দ্র থেকে আরো সমুজ্জ্বল
প্রভাত তারার চেয়ে সুন্দর তোমার সফর
তোমার কবরের কাছে হার মানে রাতের রঙ্গালয়
আলোকে আলোকে স্নাত হোক তোমার সেই নিদ্রালয়
তোমার কবরে করুক আসমান শিশির বর্ষণ
কিশলয় কুঁড়ি করুক ঐ ঘর পূর্ণ সংরক্ষণ।

অভ্যাস ও নিয়মিত আমলসমূহ

আমাতুল্লাহ তাসনীম

আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর থেকে আমি আম্মার তিনটি পর্যায় দেখেছি। প্রথম পর্যায় আব্বার জীবিত থাকাকালীন, দ্বিতীয় পর্যায় তাঁর ওফাত পরবর্তীকাল এবং তৃতীয় পর্যায় তাঁর বার্ধক্য অবস্থায়।

আব্বা জীবিত থাকতে আম্মা নামায ও তেলাওয়াতে কালাম পাকের পর গোটা সময়টা আব্বার দেখাশোনা ও খেদমতের ভেতর দিয়ে কাটাতেন। তাঁর খাবার, চা-নাশতা, পান ও প্রয়োজনীয় সকল জিনিস নিজ হাতেই তৈরি করতেন। সারাদিন এসব কাজেই কেটে যেত। রান্নাবান্না করার জন্য রাধুনি ছিল, তথাপি আব্বার কাজকর্ম তার ওপর ফেলে রাখতেন না।

সকাল সকাল উঠেই চুলায় চায়ের পানি চড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আব্বা মসজিদ থেকে আসলেই চা গরম করে নাশতা দিতেন। নাশতা ও চা পানের পর দুপুরের খাবারের জোগাড়ে লেগে যেতেন।

তিনি নিত্য-নতুনত্ব প্রিয় ছিলেন। এক ধরনের খাবারে কখনো তাঁর মন ভরত না। প্রতি দিন নতুন জিনিস, নতুন নুতন উদ্ভাবন-আবিষ্কার, নিত্য-নতুন স্বাদের খাবার এবং মিষ্টিজাত যত প্রকার খাদ্য হতে পারে সবগুলোই কেবল একবার-দু'বার নয়, বিশবারের অধিক পাক করেছেন ও তৈরি করেছেন। আব্বা খুবই মেহমানপ্রিয় ছিলেন এবং মানুষকে প্রায়ই দাওয়াত করে খাওয়াতেন। প্রতি দিনই তিনি কাউকে না কাউকে দাওয়াত করতেন এবং আম্মা খুবই মনোযোগের সাথে দাওয়াতের জোগাড়-যন্ত্র করতেন এবং কয়েক রকমের খাবার ও মিষ্টান্ন তৈরি করতেন।

আব্বা পান খেতে খুব ভালবাসতেন। দিনে কয়েকবার তাঁর পানের ডিব্বায় পান ভরে দিতে হ'ত। পানের খিলি বানিয়ে তিনি এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেন যে, মনে হ'ত এ যেন কেউ ফুলের মালা গেঁথে সাজিয়ে রেখেছে। তেমনি ফল কেটে সেগুলো প্লেটে এমনভাবে সাজাতেন যে, যেই তা দেখত অবাক হ'ত এবং প্রশংসা না করে পারত না।

জীবনের প্রথম থেকে তিনি অনুগত ও সেবাপরায়ণা স্ত্রীর আদর্শ রেখেছেন যা আব্বার জীবদ্দশায় আমরা তাঁর মাঝে দেখেছি। এ ব্যাপারে তাঁর মাঝে এতটুকু ব্যত্যয় দেখা যায়নি। আমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব আমাদের চাচা সাইয়েদ আযীযুর রহমানের ওপর সোপর্দ করে রেখেছিলেন। কিন্তু এশার পর যখন তিনি সংসারের সকল কাজকর্ম থেকে অবসর পেতেন তখন আমাদেরকে নিয়ে বসতেন। এ সময় তিনি আমাদেরকে নানা জিনিস শেখাতেন। কুরআন শরীফের ছোট ছোট সূরা এবং হাদীস পাকের দো'আ মুখস্ত করাতেন যেগুলো আজও আমাদের মনে আছে। তিনি কোন্ দো'আর কি ফযীলত তা আমাদের বলতেন। আল্লাহ্‌র রসূলের কিসসা তিনি এমন মনোমুগ্ধকর ভাষায় বলতেন যে, তা মনের গহীনে গেঁথে যেত। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও মহিলা সাহাবীদের অবস্থা এবং ওলী-বুযুর্গদের কাহিনী তিনি আমাদেরকে শোনাতেন। হযরত সাইয়েদ আবদুল কাদের জিলানী (রা)-র সত্যবাদিতার কাহিনী প্রথম তাঁর মুখেই শুনেছি এবং এ ধরনের আরও অনেক কিসসা-কাহিনীই তাঁর মুখে শুনেছি।

আম্মা কুরআন শরীফের হাফিজা ছিলেন। আমাকেও তিনি কুরআন মজীদ হেফ্‌জ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছয় পারা মুখস্তও করেছিলাম। অতঃপর তিনি এই বলে আমাকে এর থেকে ছাড়িয়ে নেন যে, এখন কোন শ্রোতা নেই। তুমি সামলাতে পারবে না।

পবিত্র মাহে রমাযানে আব্বার খেদমত সত্ত্বেও দিনের বেলায় আপন ভাতিজা সাইয়েদ হাবীবুর রহমানের কাছে কুরআন শরীফের দওর করতেন (মুখস্ত পড়ে শোনাতেন) এবং রাত্রে তারাবীহ নামাযে তা পড়তেন। আব্বার ইনতিকালের পর তিনি সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। গ্রীষ্মকালে রাত্রি আড়াইটায় ও শীতকালে রাত্রি তিনটায় এবং রমাযান মাস গ্রীষ্মে পড়লে একটার সময় ও শীতে হলে দেড়টায় তিনি তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য উঠে পড়তেন এবং নামাযে লম্বা লম্বা সূরা পাঠ করতেন। যেমন সূরা হা'দীদ, সূরা হা'শর, সূরা দুখান, সূরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা, হা'-মীম সাজদা, সূরা তূ'র, সূরা নাজ্‌ম, সূরা ওয়াকি'আ, সূরা রাহ'মান, সূরা কা'ফ, সূরা যারিয়াত ইত্যাদি। তাহাজ্জুদ নামাযে এত কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে জায়নামায ভিজে যেত এবং কখনো তিনি নিজের জন্য, নিজের সন্তান-সন্তুতির জন্য দুনিয়া কামনা করেননি, যা চেয়েছেন তাহল আল্লাহ ও রসূলের মহব্বত, দীনের মঙ্গল এবং দীনের খেদমতের তৌফীক।

ভোর চারটায় চুলা জ্বালিয়ে রেখে দিতেন এবং নিজে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। অন্যরা এ থেকে ফায়দা নিত। নামায সমাপ্ত হতেই সবাইকে জাগাতে শুরু করতেন। উঠতে অলসতা করলে তিনি খুব নারায হতেন এবং নামাযের পর শুয়ে পড়লে কিংবা ঘুমালে তার ওপর ক্রুদ্ধ হতেন। তিনি বলতেন, যারা আমাদের বাড়িতে শোবেন, ঘুমাবেন, নামাযের সময় অবশ্যই উঠবেন। এর অন্যথা হলে তারা এখানে শোবেন না বা ঘুমাবেন না। নিজে নামায পড়ে সেই জায়নামাযের ওপরই ইশরাক পর্যন্ত বসে থাকতেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযের পর ভোর পর্যন্ত নফী-ইছবাতের যিক্‌র করতেন। এরপর ফজরের নামাযের পর নির্ধারিত তসবীহগুলোর ভেতর মশগুল হয়ে যেতেন। ইশরাকের নামায পড়ে নাশতা সেরে কালামে পাক তেলাওয়াত করতেন। এরপর কিছু ঘরদোরের কাজকাম সারতেন। এরপর চাশ্‌তের নামাযের পর মুনাজাত লেখা শুরু করতেন। ইতোমধ্যেই জোহরের খাবার ওয়াক্‌ত এসে যেত। খাবার গ্রহণের পর কিছুটা সময় নিয়ে আরাম করতেন। এরপর আযানের এক ঘন্টা আগেই উঠে পড়তেন এবং জায়নামাযে বসে তসবীহ পাঠের মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন। জোহরের আযান হতেই উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামায শেষে সূরা ফাত্‌হ ও সূরা নাবা পড়তেন। এরপর পুনরায় তসবীহ পাঠ শুরু করে দিতেন। এমতাবস্থায় আসরের ওয়াক্‌ত এসে যেত। আসরের নামায পড়ে মাগরিব পর্যন্ত পুনরায় কালাম পাকের বিভিন্ন সূরা পাঠ করতে থাকতেন। আর এভাবে তিনি এক নামায শেষে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষা করতেন।

যতদিন শক্তি ছিল, সাহস ছিল, হিম্মত ছিল- ততদিন ঘরবাড়ি দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু আমার ছোট ভাই আলীর (আবুল হাসান আলী নদভী) বিবাহ হতেই পুরো বাড়িঘরের যাবতীয় দায়দায়িত্ব বৌমার হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে সংসারের সকল ঝক্কি-ঝামেলা থেকে সরিয়ে নেন। লাখনৌর বাসাবাড়ির দায়দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন বড় পুত্রবধূ সাইয়েদ আবদুল আলীর স্ত্রীর হাতে। রমাযান শরীফে তারাবীহ নামাযে কালামে পাক বরাবরই শোনাতেন। বার্ধক্যে দুর্বলতা বৃদ্ধি পেলে বসে শোনাতে থাকেন। এক সময় এতটুকু শক্তিও যখন আর রইল না তখন বাধ্য হয়েই তা থেকে ক্ষান্ত হতে হ'ল। দৃষ্টিশক্তিও বিদায় নিয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য যে, দৃষ্টিশক্তি অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু আমরা ছাড়া খান্দানের আর কেউ তা জানত না। ফলে তিনি সেই হাদীসে কুদসীর আওতায় শামিল হন যেখানে বলা হয়েছে ঃ

"যখন আমি আমার বান্দাকে বিপদ ও মুসীবতের মাঝে নিক্ষেপ করি অর্থাৎ

তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিই আর সে এতে ধৈর্য্য ধারণ করে (এজন্য কোন অভিযোগ করে না, হা-হুতাশ করে না) তখন আমি এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করব।"

দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর দিন-রাত তসবীহ-তাহলীল, নামায ও কালামে পাকের তেলাওয়াতই তাঁর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি সব সময় আতংকিত থাকতেন নামাযের সময় চলে গেল কি না অর্থাৎ নামায কাযা হয়ে গেল কি না। ঘড়ি মাথার কাছেই থাকত। কারো আগমন-নির্গমন টের পেলেই জিজ্ঞেস করতেন, কয়টা বাজে? আমি সব সময় তাঁর পাশেই থাকতাম। মুহূর্তের জন্যও ঘরের বাইরে গেলে তিনি ডাকাডাকি করতেন। অধিকাংশ সময় আমি বলতাম, আমি পাশেই আছি, নামাযের সময় হলেই বলব। কিন্তু এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতেন না। দশ মিনিট না হতেই জিজ্ঞেস করতেন, কয়টা বাজল? মাগরিবের সময় তো দরজার ওপর একজন মানুষই বসিয়ে দিতেন যে, আযান শোনামাত্রই আমাকে বলবে। রাত্রিবেলা বিশেষভাবে নির্দেশ ছিল, ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখার। তারপরও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না, আবার জিজ্ঞেস করতেন এ্যালার্ম দেওয়া হয়েছে কি না। যদি হঠাৎ কখনও এ্যালার্ম দিতে ভুল হয়ে যেত, ঘড়ি না বাজত এবং তিনি টের না পেতেন তাহলে খুব নারায হতেন এবং সারাটা দিন তিনি এর জন্য আফসোস করতেন। এশার নামায পড়ে তিনি শুয়ে পড়তেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জেগে যেতেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, আমি কি এশার নামায পড়েছি। আমরা যখন বলতাম যে, হাঁ, পড়েছেন, তখন বলতেন, মনে আছে তো, তোমরা দেখেছ। এরপর তাঁর নিজেরই স্মরণ হ'ত এবং বলতেন, হ্যাঁ, পড়েছি বলে মনে পড়ছে। এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে যেতেন। দীর্ঘকাল থেকেই তাঁর নিয়ম ছিল, নাশতা-পানি সারার পর সূরা ফাতিহা, আলিফ-লাম-মীম মুফলেহূ'ন পর্যন্ত, আয়াতু'ল-কুরসী, আমানা'র-রাসূল, সূরা ইয়াসীন শরীফ, লাক'াদ জাআকুম থেকে 'আরশি'ল-'আজীম পর্যন্ত, সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াত, আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম, সূরা আলাম নাশরাহ' লাকা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক', সূরা নাস, ইয়াকাদুল্লাযীনা থেকে বিমাজনূন পর্যন্ত, কুল মায়্যুসীবুনা থেকে মু'মিনূন পর্যন্ত, ওয়া ইয়্যামসাসকাল্লাহু বিদু'ররিন ফালা৷ কাশিফালাহু ইল্লাহু ওয়া ইয়্যুরিদকা বিখায়রিন ফালা রাদ্দা লিফাদ'লিহি, য়ূসীবু বিহি মাইয়্যাশাউ; ওয়াল্লাহু গাফূরুর রাহ'ীম; 'রাব্বিশরাহ'লী স'াদরী' থেকে 'ইয়াফক'াহূ ক'াওলী পর্যন্ত, 'আল্লাহুম্মাজ'আল ফী ক'ালবী নূরান' থেকে শেষ অবধি এবং হি'যবু'ল-আজম-এর

কতিপয় নির্দিষ্ট দো'আ ও তুনাজ্জিনা দরূদ শরীফ পড়ে পানিতে ফুঁক দিতেন এবং সেই পানি ঘরের সকল লোককে পান করাতেন। এরপর তিনি রোগী দেখতে লোকের বাড়িতে যেতে শুরু করেন। দূরদরাজ এলাকা থেকে লোকে তাঁর পানি পড়া নেবার জন্য আসত ও পানি নিয়ে যেত। আল্লাহ্‌র ফযলে লোকে আরোগ্য লাভ করত। শেষ অবধি খান্দানের সমস্ত লোকই আম্মাকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতে থাকে এবং তিনিও সবাইকে পরম সমাদরে ও যত্নে হাত বুলিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন। আমরা এতে বেশ আমোদ অনুভব করতাম। সমাগত মহিলারাও তাঁকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিত।

খোরাক একেবারেই কমে গিয়েছিল। সকালে একটা বিস্কুট ও এক পেয়ালা চা, দুপুরে ও সন্ধ্যায় এক চিলতে রুটি ও দুই লোকমা ভাত। জানি না এত কম খেয়ে তিনি কিভাবে বেঁচেছিলেন।

দীর্ঘ দিন থেকে তাঁর দিল্ খুবই অস্থির থাকত। তিনি প্রায় বলতেন, খুব অনিশ্চয়তা বোধ ও টানাপোড়েন (اختلاج) বোধ করছি। এটা দূর করার জন্য তৎকর্তৃক রচিত মুনাজাত তাঁকে শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে বেশ উপকার পান, তাঁর মানসিকতায় প্রশান্তি ফিরে পান। তিনি তাঁর মুনাজাত ভুলেই গিয়েছিলেন। বিস্মৃত মুনাজাত শুনতেই তিনি মজা পেতে থাকেন। তিনি এই ভেবে আরও খুশী হন যে, এ ধরনের দো'আ তিনি করেছেন আল্লাহ্‌র দরবারে। আর যে এইভাবে চাইতে পারে সে কী মাহরূম হতে পারে? এই ধারণা তাঁকে অনেকখানি সান্ত্বনা দান করে। দৈনিক তিন-চারটে করে মুনাজাত শোনানো হ'ত।

ইনতিকালের আগে থেকে আমাদের পাচিকা খুবই খেদমত করেছিল। তিনি তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, দেখ হালীমা! দৈনিক সূরা ওয়াকি'আ পড়বে। তাহলে তোমাকে কখনো অনাহারে থাকতে হবে না। আর তোমার সব ছেলেমেয়েদের নামাযের তাকীদ দেবে। নইলে তোমাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ১৯বার করে বিসমিল্লাহি'র রাহ'মানি'র-রাহ'ীম পড়ে দো'আ করবে, দো'আ কবুল হবে।

দুনিয়ার প্রতি তিনি সব সময় নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ ছিলেন। আর এখন তো এর প্রতি তাঁর ঘৃণাই ধরে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, আমার কাছে দুনিয়ার কথা, জাগতিক কথাবার্তা বল না। ফ্যাশনের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক দুশমনী। আমাদের বলতেন, যদি কখনো তোমরা ফ্যাশনেবল কিছু গ্রহণ কর তাহলে তোমাদের প্রতিও কিন্তু আমার ঘৃণা ধরে যাবে।

আম্মা-বী ঃ দো'আ, মুনাজাত ও বক্তব্যের আলোকে

মুহাম্মদ হাসানী

আম্মা-বী আমাদের গোটা খান্দানের জন্য কল্যাণ ও বরকত, স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং নূরানিয়াত ও লিল্লাহিয়াতের উৎস ছিলেন এবং তাঁর তিরোধানের পর খান্দানের সকল সদস্যই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছেন যে, এ বিরাট নে'মত তাদের হাত থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে। লেখকের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর পাশে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল। এ ধরনের আল্লাহ তায়ালা, পাক-পবিত্র ও সৌভাগ্যবান বান্দা-বান্দীদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই মূল্যবান এবং প্রতিটি ঘন্টাই বরকত জয়। কিন্তু আপন যিন্দেগীর শেষ মুহূর্তে যখন তারা পরম স্রষ্টার প্রিয় সান্নিধ্যে পুরস্কার নেবার জন্য গমন করতে উদ্যত হন সে সময় তাদের শানই হয় অন্য রকম। এ সময় খোদাওয়ান্দ করীমের রহমত অধিক পরিমাণে ও অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়ে থাকে। বরং বলা উচিত যে, আল্লাহ্‌র রহমতের জোশ প্রবল বেগে আন্দোলিত হতে থাকে। আম্মা-বীর জীবরে শেষ মুহূর্তগুলোও কিছুটা এ ধরনেরই ছিল। সে সময় কার বরকত ও নূরানিয়াত তৃপ্তি ও প্রশান্তি আমাদের মত ভোঁতা ও মলিন দিলের লোকেরা ও অনুভব করত।

লেখকের শ্রদ্ধেয় পিতামহ হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (র) তাঁর মুহতারাম পিতা হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ্ আলায়হের ইনতিকালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে লিখেছেন যে, "তাঁর ইনতিকালের সময় আনন্দ, মত্ততা ও প্রশান্তির একটি চাদর যেন গোটা পরিবেশকে ঢেকে রেখেছিল। যেই রাতে তিনি ইনতিকাল করেন, মনে হচ্ছিল সেই রাতটা ছিল শবে কদর। আমাদের ওপর শোক-দুঃখ ও বিপদের আদৌ কোন ছাপ কিংবা চিহ্ন ছিল না। যিক্‌রে ইলাহী বলন্দ ও স্পষ্ট আওয়াজে অব্যাহত ছিল যা সবাই শুনছিল।"

আম্মা-বী'র অবস্থাও ছিল তদ্রূপ সদৃশ। তাঁর ইনতিকালের সময় সেই সব ভয় ভীতি, দুঃখ ও বিমর্ষতার কোন চিহ্ন দেখা যায় নিয়া সাধারণত এ সময় দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অব্যাহতভাবে যিক্‌র চলছিল এবং তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আর এমত অবস্থায় তিনি তাঁর জীবন প্রদীপকে তাঁর পরম স্রষ্টার হাতে

তুলে দেন এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করেন। "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া; আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমর জান্নাতে প্রবেশ কর।" সূরা ফাজর, ২৭-৩০ আয়াত।

আম্মা-বীর জীবনে আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় রয়েছে এবং তার প্রতিটি দিকই লক্ষ্যযোগ্য। এর মধ্যে তিনটি বিষয় খুবই স্পষ্ট। একটি হল, দো'আ ও মুনাজাতের সেই অত্যাশ্চর্য অবস্থা যে ক্ষেত্রে তিনি খুবই বিশিষ্ট ও অগ্রগামী, বরং বলা চলে একক বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল ছিলেন। দ্বিতীয়টি হল, দীনের শক্তি ও উন্নতি, ইসলামের বিজয়ের জন্য সত্যিকার দরদ ও ব্যাকুলতা, উত্তাপ ও জ্বালা এবং তৃতীয়টি হল, প্রশিক্ষণ ও সর্বোত্তম সামাজ জীবন।

আমরা নিচে তাঁর কবিতা ও মুনাজাতের কিছু নমুনা পেশ করছি যা তাঁর দিলের অবস্থা ও কাইফিরাত এবং তাঁর বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। এরপর উত্তম প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টির কিছু নমুনা স্বয়ং তাঁর বাণী ও লেখনীর সহায়তায় পেশ করতে চেষ্টা করব। "আর তৌফিক একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে।"

দুনিয়ার অনিত্যতা, দুনিয়ার নীচতা, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা এবং একে নিকৃষ্ট, অবজ্ঞেয় ও হেয় ভাবা তাঁর এমনই এক অবস্থা ছিল যার ভেতর কৃত্রিমতার আদৌ কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু এরই সাথে সাথে দুনিয়ায় থাকা এবং সুরুচির সঙ্গে জীবন যাপন করার যেই আদর্শ ও নজীর কায়েম করেছিলেন তা একেবারে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুলর্ভ তো বটেই। একদিকে আলমে কুদ্‌স-এর সঙ্গে সেই সম্পর্ক, দো'আ ও মুনাজাতের সঙ্গে এমন হার্দ্যিক সম্বন্ধ এবং পার্থিব জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও নিস্পৃহ মানসিকতা। কোন লোক যদি কেবল তাঁর একদিক দেখে তাহলে বলবে যে, এধরনের লোক দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরাসক্ত ও বিরাগ এবং পার্থিব জগত সম্পর্কে অজ্ঞই হবেন এবং হক্‌কু'ল-ইবাদ তথা বান্দার হক আদায় করা তার পক্ষে কঠিন হবে বৈকি। অপর দিকে দুনিয়াকে ব্যবহার করার সেই সুনীতি এবং মৌলিক ও বুনিয়াদী ব্যাপারগুলোতে এমন খুঁটিনাটি জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মেধা এবং ঘরকন্যার ব্যাপারে এমন যোগ্যতা ও নৈপুন্য ছিল যে, যদি কেউ কেবল এই দিকটার ওপরই দৃষ্টিপাত করত তাহলে সে বলত যে, এমন একজন লোক দো'আ ও মুনাজাত, ইবাদত-বন্দেগী ও তেলাওয়াতে কালামে পাকের জন্য সময়, দিল ও দিমাগ কিভাবে বের করেন।

আম্মা-বীর মধ্যে এই দু'টো জিনিস এমন সুন্দর ও সুচারুভাবে মিলিত

হয়েছিল যে, একে কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ .

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না" (সূরা আর-রাহমান, ১৯-২০ আয়াত)[১] ব্যতিরেকে আর কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

দুনিয়াকে সম্বোধন পূর্বক কতই না সহজ-সরলভাবে ও সততার সঙ্গে তিনি বলেনঃ

گھبرانہ ہم سے دنیا تجھ مین نہ ہم رہیں گے +
اپنا وطن عدم ہے جاکر وہیں بسیں گے
شیوہ تیرا دغا ہے شیوہ تیرا جفا ہے +
تو سخت بے وفا ہے ہم صاف ہی کہیں گے
ہاں تو ستا لے ہم کو جتنا ستانا چاہے +
کیا ہوگا جب خداسے فریاد ہم کریں گے
تیری یہ بے وفائی تیری یہ کج ادائی +
تیری ستم ظریفی کب تک یہ ہم سہیں گے
آتا ہے جو یہاں وہ رہتا ہے تجھ سے نالاں +
ایک روز ہم بھی تجھ سے منہ پھیر کر چلیں گے
کر کچھ تواب بہلانی مہمان ہم ہیں تیرے +
جب ہوں گے تجھ سے رخصت پھرہم نہیں ملیں گے
تو ہم سے گر خفاہو پروا نہیں ہے ہم کو +
مالک ہو ہم سے راضی جس کے یہاں رہیں گے
بھیجا تھا اس نے ہم کوترے یہاں یہ کہہ کر +
جب ظلم ہوگا تجھ پر انصاف ہم کریں گے
انصاف کیا ہو بہتر یہ ظلم کی ہے بانی
جو کچھ ستم کرے گی سب کچھ وہ ہم سہیں گے

ঘাবড়িও না হে দুনিয়া
থাকবো নাকো তোমার মাঝে

১. আয়াতটিতে মিষ্টি ও নোনা পানির সেই প্রবাহিত ধারা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা একই উৎস থেকে উৎসারিত যা পাশাপাশি প্রবাহিত হলেও একে অপরকে অতিক্রম করেনা। অথচ উভয়ের মাঝে কোন অন্তরাল নেই। বলাই বাহুল্য, ইহা আল্লাহ পাশের কুদরতের একটি নিদর্শন।

স্থায়ী বাস আখিরাতে
গড়বো নিবাস সেইখানেতে।
রীতি তোমার দাগা দেওয়া
রীতি তোমার অত্যাচার
তুমি নেহাৎ বে-ওফা[১] যে
দ্বিধা নেই আমার তা বলবার
জ্বালা যত দিতে পার
দাও তুমি তা সাধ্যমত
টের পাব তা যখন আমরা
করবো নালিশ খোদার কাছে।
তোমার এসব অত্যাচার
তোমার এসব দুষ্টুপনা
তোমার এসব মশ্‌করা কও
আর কতদিন সওয়ার আছে?
যারাই আসে এখানে দেখি
সবারই তো নালিশ থাকে
তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে
একদিন আমি যাবই চলে।
ভালমানুষী করতে চাইলে
এক্ষুণি তা নাওকো করে
আজকে তোমার মেহমান আছি
পারবে না তা চলে গেলে।
তুমি যদি বেজার থাকো
তার কিছুই পরোয়া নেই
মালিক মোদের রাজীই আছে
যার ঘরে থাকতে হবে।
পাঠিয়ে ছিলেন তিনিই মোদের
তোমার কাছে এই না বলে
যুলুম হলে তোদের পরে
সুবিচার তার করা হবে।
ইনসাফ কিসের করবে 'বেহ্‌তের'

টীকা -১. বে-ওফা-অবিশ্বস্ত।

ফুলুমেরই আকর সে যে
যুলুম যতই করবে সে
তা সইবার সাহস আছে।।

দুনিয়ার অনিত্যতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের ওপর তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে যার প্রতিটি চরণের শেষ جو آج ہے وہ کل ہیں দ্বারা করা হয়েছে। এরই কয়েকটি চরণ পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হল।

اے مومنوا ہو شیار ہو جوآج ہے وہ کل نہیں
سوتے ہو کیوں بیدار ہو جوآج ہے وہ کل نہیں
کرنا ہے جو کر لوابھی کیا زندگی کا آسرا+
کیوں رکھتے سر پر بار ہو جو آج ہے وہ کل نہیں
دنیا پہ تم نازاں نہ ہو ہیں چاردن کے یہ مزے +
تم اس سے بس بیزار ہو جوآج ہے وہ کل نہیں
ہو عیش یا آرام ہو جو کچھ بھی ہو سب ہے فنا +
مفلس ہو یا زردار ہو جوآج ہے وہ کل نہیں
جو کچھ کہ دیکھا ہم نے یاں وہ خواب تھا بھولا ہوا +
کیوں دل نہ اس سے زار ہو جوآج ہے وہ کل نیہں

হে মুমিনরা হুশিয়ার
আজ আছে যে কাল সে নেই!
শুয়ে কেন জেগে ওঠো
আজ আছে যে কাল সে নেই!
করার যা' এক্ষুণি কর
যিন্দেগানীর নেই ভরসা,
মাথার বোঝা রাখছো কেন
আজ আছে যে কাল সে নেই!
দুনিয়া নিয়ে মজা করো না
চার দিনেরই মজা এটা,
বসায়ো না মন এতে
আজ আছে যে কাল সে নেই!
আরাম আয়েশ যা-ই আছে
সবই এর ফানা হবে
ফকীর কিংবা মস্ত আমীর

আজ আছে যে কাল সে নেই!
এখানেতে যা দেখেছি
স্বপ্ন মায়া মরীচিকা
মাতম কেন করবো না কো-
আজ আছে যে কাল সে নেই!

আল্লাহ্‌র ওপর তাঁর এতটা গর্ব ও আস্থা ছিল যদ্দৃষ্টে সেই হাদীসের কথাই স্মরণ হয় যেখানে বলা হয়েছে ঃ رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابرّه "পেরেশান হাল ও ধুলি ধূসরিত এমন বহু বান্দা আছেন যদি তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বসে তবে আল্লাহ্ পাক তাদের কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন"।

দেখুন কতটা ব্যথা ও অস্থির উন্মাদনা নিয়ে কী পরিমাণ আস্থা ও ভরসা নিয়ে এবং কী প্রত্যয় ও ভালবাসা সহকারে তিনি তাঁর মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন!

جو مانگا ہے، جو مانگیں گے، خداسے ہم وہی لیں گے +
مچل جائیں گے، روئیں گے، کہیں گے ہم یہی لیں گے
نہیں گوہم کسی قابل ، مگر تیری عنایت ہے +
جو تیری شان کے لائق ہے ہم تجھ سے وہی لیں گے
کیا تونے طلب ہم کو اٹھیں گے ہم نہ اس درسے
نہ جائیں گے نہ جائیں گے ابھی لیں گے وہی لیں گے
ارے بہتر نہ تو گھبرا جومانگے گی وہ پائے گی
کہے گی جب تو یہ روکر کہ ہم اس دم یہی لیں گے

যা মেগেছি যা মাগবো
খোদা থেকে তা-ই নেব
জেদ ধরব, করবো রোদন
বল্‌বো আমি তা-ই নেব।
যদিও নই যোগ্য আমি
কিন্তু তোমার দয়া আছে
তোমার শানের লায়েক যা
তোমা থেকে তা-ই নেব।
যদি তুমি তলব কর
এ দ্বার থেকে উঠবো না কো
যাবো না যাবো না আমি

এখন নেব তা-ই নেব।
আরে বেহ্‌তর ঘাবড়াবি না
চাইবি যা তুই তা-ই পাবি
বলবি যখন কেঁদে কেটে
এক্ষণ আমি এটাই নেব।

তিনি বলতে চেয়েছেন যে, দো'আর তৌফীক পাবার অর্থই হল ঃ আল্লাহ তা'আলা চান, তাঁর বান্দা তাঁর কাছে অন্তর খুলে সমগ্র দেহ-মন উজাড় করে প্রার্থনা করুক। এজন্য এমত মুহূর্তে কোন প্রকার গাফিলতি প্রদর্শন, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও উপেক্ষা দেখানো, হতাশ কিংবা হিম্মতহারা হওয়া সমীচীন নয়। দো'আর তৌফীকের পেছনে এই দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি তো দিতেই চাই, কিন্তু তুমিও চাইতে শেখো।

একটি মুনাজাত তিনি এভাবে শুরু করেছেন ঃ

ہوئی جو در تک ترے رسائی ، تو تجھ سے میرا سوال بھی ہے
تو دینے والا کریم بھی ہے ، تو قادر ذو الجلال بھی ہے
یہ شان دیکھی تري نرالی جو مانگے تجھ سے تو اس سے راضی
بلا کے دینا کرم ہے تیرا، یہ فضل بھی ہے، کمال بھی ہے

দ্বারে তোমার পৌঁছনু যখন
চাওয়া আছে তোমার কাছে
দাতা তুমি করীম তুমি
কাদির তুমি যু'ল-জালালও।
তোমার এ শান আজব মাবূদ
যাচে যে তায় তুমি রাজী
এ দুনিয়া তোমারই দান
সফল তোমার তা কামালও।

পরিশেষে বলেন ঃ

نہیں ہے بہتر کواب گوارہ کہ دل ہو یاں رہ کے پارہ پارہ
ملے وہ گھر جس میں لطف بھی ہے اور وصال بھی ہے

বেহ্‌তরের আর মন মানে না
এখান থেকে মন উঠেছে
সেই ঘরই চাই যেখানে মজা
দয়া-মায়া মিলন আছে।

কিন্তু তাঁর এই মুনাজাত কেবল তাঁর নিজের দিলের অবস্থা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, শত্রুদের জ্বালা, ইসলামের দারিদ্র্য দশা, রোগ-ব্যাধি ও মহামারী, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস, আর্থিক চিন্তা দৈন্য দশা ও সমস্যা-সংকট, রমাযানু'ল-মুবারকের-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত এবং মদীনা তায়্যিবায় হাযিরা সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের জুলুম ও অত্যাচার, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের নিত্য নতুন পরিকল্পনা ও চক্রান্ত এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন ঃ

لگائی ہے جو آگ اس دم انھوں نے　　اسی زار میں ناریوں کو جلا دے
ہم اسلام والے ہیں ، ایمان والے　　نہ تو ان کے ہاتھوں سے ہم کو سزا دے
برے یا بھلے ہیں مگر ہم ہیں تیرے　　جو ہوں کام بگڑے ہمارے بنادے
ہو ادنی مسلمان میں بھی یہ قوت　　پکڑ کر سران کا زمیں پر گرادے
چلے کوئی جادو اب ان کا نہ ہم پر　　جو سوتے بھی ہوں ہم تو ہم کو جگادے

লাগিয়েছে এ আগুন যারা
এ মুহূর্তে বিশ্বজোড়া
জ্বালিয়ে দাও সে দোযখীদের
বিলাপ দিয়ে অন্তরফাঁটা
আমরা মুসলিম আমরা মুমিন
বেঈমান দিয়ে দিয়ো না-সাজা।
ভাল মন্দ যা-ই হই না
শেষ তক তো তোমার মোরা
বানিয়েই দাও কাজ আমাদের
যা-ই আছে ভাঙাচোরা।
মুসলমান সে যা-ই হোক না-
শক্তি তার যদিও নাই,
শক্তি তুমি দিয়েই দাও
শত্রু করুক ধরা-শায়ী
চল্‌তে নারে তাদের কোন
প্যাঁচ ও যাদু আমাদের পরে
ঘুমিয়ে যদিও থাকে মুমিন
দাও চেতনা জাগার তরে।

অনাবৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এক মুনাজাতে বলেন ঃ

یا الہ العالمیں ہے توہی خیر الراز قیں!
توہی خیر الرازقیں ہے تو خیر الراحمیں
جھوم کراٹھے گھٹا یا رحمۃ للعالمیں
نام کو سبزہ نہیں سو کھی پڑی ہے سب زمیں
برسادے یارب اس قدر سر سبز ہو ساری زمیں
مٹ جائیں سارے رنج وغم آباد ہو اہل زمیں

ইয়া এলাহা'ল-আলামীন
তুমিই খায়রুর রাযিকীন
তুমিই খায়রুর রাযিকীন
তুমিই খায়রুর রাহিমীন
ঘন ঘটায় ভরো আকাশ
রহমতুল্-লি'ল-আলামীন
সবুজের লেশমাত্র নেই
চৌচির গোটা যমীন
বর্ষণ কর ইয়া মালিক মাবুদ
সবুজ শ্যামল হোক যমীন
সকল দুঃখের থেক অবসান
দুনিয়া আবাদ অভাবহীন।

বৃষ্টির আধিক্য এবং বানভাসি থেকে মুক্তির প্রার্থনায় উচ্চারিত তাঁর সহজ সরল অনবদ্য আর্তি ফুটে উঠেছে নিচের পংক্তিগুলোতে ঃ

مینھہ برستا ہوا تولے اب تھام   اس میں ہوتا نہیں ہے ہم سے کام
بہہ رہا چار سو جو دریا ہے   ہیں پریشاں اس سے خاص وعام
آسماں پر گھٹا وہ چھائی ہے   صبح بھی ہوگئی ہے مثل شام
خوف طغیانی سے ہیں سب سہمے   کہتے ہیں دیکھئے ہو کیا انجام
ہو نگہ تیرے رحم کی مولی   خوف جاتا رہے ہو بس آرام
توہی حافظ ہے توہی ناصر ہے   تجھ سے کہتی ہوں تیرا لے کرنام
تجھ سے بہتر کی بس یہی ہے دعا
اپنے بندوں کو کرنہ تو ناکام

বর্ষণরত বিষ্টি ওরে থামরে থাম!
এর মধ্যে যে হয়না কারোই কোনই কাম!

চারদিকে ভাসছে সবি বইছে বান
আম খাস সকলেই ব্যস্ত পেরেশান
ঘনঘটায় গোটা আকাশ ছেয়ে যায়
ভোর সকালই দেখতে যেন সন্ধ্যা হায়!
বানে ভয়ে কাঁপছে সবে ভীত প্রাণ
বলছে সবাই না জানি হায় কী আঞ্জাম?
দায়র চোখে চাও খোদা কর রহম
ভয় ভীতি দূর করে আমাদের দাও আরাম!
তুমিই রক্ষায় কর মদদ দান
তোমাকেই ডাকি লই তোমার নাম!
তোমার কাছে বেহ্‌তরের এই দু'আ
বান্দাদের করো না তুমি না-কাম।

লেখকের জন্মের সময় তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল এই ঃ "کام ہو میرا ترے فضل وکرم کا نام ہو"

অর্থাৎ "কাম হবে আমার প্রভো
নাম হবে তোমার দয়ার।"

এই কবিতাটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবপূর্ণ। একে আমি আমার জন্য সৌভাগ্যের আঁকর ও নাজাতের ওসীলা মনে করি।

فضل سے تیرے ہوئی آسان یہ مشکل اڑی
اور خوشی کي بے تعب تو نے دکھائی یہ گھڑی
توہی کر آسان یارب ہیں یہ جتنی مشکلیں
دور ہو جائیں یہ ساری زخمتیں اور کلفتیں
صدقہ احمد صہ کا محمد ہو مرے گھرکا چراغ
دیکھ کراس کو الٰہی دل ہوں سب کے باغ باغ
اور پیدا کر محمد ہیں الٰہی وہ کسال
اور محمد ہو الٰہی جدا مجد کی مثال
خوش ہوں اس کو دیکھ کر سب اور اسکے والدین
بس وہ ہو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہوئے دل کا چین
نظم ہو مقبول میری اور خوش انجام ہو
کام ہو میرا ترے فضل و کرم کا نام ہو

তোমার ফজলে হলো মুশকিল আসান

সহজে দেখালে সুখ এই ঘড়ি দুঃখ অবসান
যতই মুশকিল সম তুমি প্রভু করহে আসান
সকল দুঃখের সম হয় যেন হেক আসান।
আমাদের ওসীলাতে হোক আমার মুহাম্মদ ঘরের চেরাগ
তাকে দেখে আয় এলাহী, সবে যেন হয় বাগবাগ্
পয়দা কর হে এলাহী তার মাঝে এমনি কামাল[১]
মুহাম্মদ হয় যেন তাঁর আদি পুরুষের[২] মিছাল[৩]
তাকে দেখে খুশী হউন পিতামাতা আর সর্বজন
জুড়াক সকল চোখ তুষ্ট হোক সকলের মন।
আমার কার্যতা হোক মকবুল তোমার দরগায়
কাজ হোক মোর প্রভু, তব দয়া যেন নাম পায়।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের হাযিরা কি রকম চেখে চেখে বর্ণনা করছেন এবং একে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সেই দো'আ ও মুনাজাতের ফল বলে মনে করেন যা ছিল তাঁর রূহ ও দিলের খোরাক এবং তাঁর ওষুধও বটে।

کہاں ملتی ہے یہ دولت وعزت
ہوئی دربار میں کس کی رسائی
رہی دربار میں حاضر جو ہر دم
یہ نعمت اور دولت ہاتھ آئی
کیا جو زندگی کو تلخ تو نے
ضعیفی میں یہ راحت تونے پائی
نیتجہ ہے فقط تیری دعا کا
بڑھا پے میں تجھے پہونچی بھلائی
لگائی تھی جو تونے آس بہتر
جوکی امید تونے وہ برآئی

কোথায় মিলতে পারে দৌলত সম্মান
কার ভাগ্য জোটে দরবারে পৌছান
দরবারে হাজির যে-ই রয়েছে হরদম
মিলেছে তাদের জন্য এই নিয়ামত
যেহেতু করেছ তিক্ত পুরোটা জীবন
বার্ধক্যে পেয়েছে শান্তি কাছেই মরণ!
এতো শুধু জুগিয়েছে দোয়ার ফসল

টীকা ১. কামাল– কৃতিত্ব, পূর্ণাঙ্গতা (২) মহানবী হুযুর (স.) (৩) মিছাল-নমুনা, অনুরূপ।

বার্ধক্যে পেয়েছে এন্তার কল্যাণ মঙ্গল
যে আশা পুষেছ বেহতর জীবন ভরে
তাই জীবন সন্ধ্যায় গিয়াছে পুরে।

মদীনায়ে তায়্যিবায় বিরাজিত বসন্তের উল্লেখ করত এর থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বিদায়ের ছবি এঁকেছেন এভাবে। দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি ছত্র এই ঃ

یہ سماں ، یہ لطف ، یہ دولت کہاں ہوگی نصیب
اور زیارت گنبد خضرا کہاں ہوگی نصیب
دل کو راحت آنکھ کو ٹھنڈک کہاں ہوگی نصیب
یہ مبارک صحبتیں ہم کو کہاں ہوں گی نصیب
جائیں ہم کیونکر مدینہ کی فضائیں چھوڑکر
یہ بہاریں اور یہ دلکش ادائیں چھوڑ کر

এই দৃশ্য এই আনন্দ এ দৌলত
জুটিবে ভাগ্য কোথা আর?
সবুজ গম্বুজ যিয়ারত
জুটিবে ভাগ্যে কোথা আর?
অন্তরে প্রশান্তি চোখে শীতল পরশ
জুটিবে ভাগ্যে কোথা আর?
বরকত পূর্ণ সুহ্বত আমাদের তরে
জুটিবে ভাগ্যে কোথা আর?
কেমন করে যাবো আমি
এই সোনার মদীনা ছেড়ে?
এমন মধুর দৃশ্য এ সুন্দর রীতিনীতি ছেড়ে?

পবিত্র ভূমি থেকে বিদায় গ্রহণের মুহূর্তে তিনি এভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ঃ

اے خدا پھر اسی دربار میں لانا مجھ کو   اپنے دربار کا سائل ہی بنانا مجھ کو
پھر ترے خانہ کعبہ کا کروں آکے طواف   پھر مزے لطف ومحبت کے چکھانا مجھ کو
روضہ پاک پہ ہردم میں کروں جاکے سلام   اور ملے ارض مقدس میں ٹھکانا مجھ کو
زندگی میری خدا یا ترے درپر گذرے   ساتھ ایمان کے دنیا سے اٹھانا مجھ کو
ہندمیں رہ کے خدا یا نہیں راحت مجھ کو   اب تو طیبہ ہی میں ملجائے ٹھکانا مجھ کو
قلب ہے میرا ضعیف اور سفر ہے مشکل
تواگر چاہے تو مشکل نہیں آنا مجھ کو

হে খোদা এই পাক ভূমিতে
আবার তুমি এনো মোরে
তোমার দরবারে ভিক্ষুক
বানাইও তুমি ফের মোরে।
আবার যেন কা'বায় এসে
করি তোমার ঘরের তওয়াফ
আবার তোমার মহব্বতের
অপূর্ব স্বাদ চাখিয়ো মোরে।
রওযা পাকে দাঁড়িয়ে সালাম
যেন পারি করতে আবার
এই পবিত্র পাক ভূমিতে
মিলে যেন ঠাঁইটি আমার।
জীবন আমার যায় যেন গো
কেটে তোমার দ্বারের পরে
ঈমান সাথে বিদায় যেন
ভাগ্যে আমার জুটতে পারে।
হিন্দুস্তানে থেকে খোদা আর তো মিলেনা শান্তি
মদীনা তাইয়েবা ভূমে একটু ঠাঁই মিলিতে পারে!
কল্‌ব আমার ভীষণ যয়ীফ
সফরেতে কষ্ট ভারী
চাইতে তুমি আমি খোদা
সে কষ্ট সহিতে পারি।

মুহতারাম ও মখদূম চাচাজান মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী মাদ্দা জিল্লুহুর নিমিত্ত তাঁর দো'আর অবস্থা আর কি বলব। এজন্য কেবল এতটুকু বোঝাই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল দো'আ আর তাঁর সমগ্র দো'আই ছিল চাচাজানের নিমিত্ত। তিনি যে সময় দো'আ করতেন এবং যার জন্যই করতেন তা মূলত তাঁর (চাচাজানের) জন্যই হত, 'বাব-ই রহমত' ও কলীদ-ই বাবে রহমত"-এর প্রতিটি পৃষ্ঠাই তার সাক্ষী।

আম্মা-বীকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও ইয়াকীন, যওক ও শওক এবং আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের সাথে সাথে যা আল্লাহ্র বিশিষ্ট ও মকবুল বান্দাদেরই হিস্যা-প্রশিক্ষণ দানের যেই যোগ্যতা দান করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ

পেছনের অধ্যায়গুলোতে পাঠক ইতিমধ্যেই পাঠ করে থাকবেন। এখানে কেবল তাঁর 'হুস্‌ন-ই মু'আশারাত' নামক জনপ্রিয় গ্রন্থ্‌ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। এ থেকেই আপনারা জানতে পারবেন, তাঁর দৃষ্টি সমাজ জীবনের কোন প্রত্যন্ত কোণ্‌ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল এবং সমাজের সেই সূক্ষ্ম ও নাযুক দিকও যে দিকে অধিকাংশ লোকেরই নজরও পড়ে না-তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারত না।

এই বইটি কেবল তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, বরং স্বীয় ভাষা ও বাকভঙ্গীর দিক দিয়েও অনাড়ম্বর ও প্রকাশ সৌকর্যের সর্বোত্তম নমূনা। বিস্ময় জাগে যে, একান্ত আপন ভুবনের অধিবাসিনী এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের মাঝ দিয়ে জীবন অতিবাহিতকারিনী একজন মহিলা হাতে কলম তুলে নিচ্ছেন ও এভাবে ছবি আঁকছেন এবং সমাজ ও মনোবিজ্ঞানের বাস্তব সত্যগুলো এবং সমাজের ছবি সহজ-সরলভাবে ও সাবলীল বাক্যে এভাবে পেশ করেছেন যে, তা উজ্জ্বল ও জীবন্ত মনে হয়।

এ বই তিনি বিশেষভাবে মুসলিম বালিকাদের জন্য লিখেছেন। কিন্তু বইটি প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জন্যই উপকারী। বইয়ের ভূমিকায় এক স্থানে তিনি লিখছেন ঃ

"তোমরা যদি মনে কর যে, আমরা সব কিছুই পারি এবং সুযোগ এলে ও মওকা পেলে আমরা সব কিছুই করতে পারি তাহলে এটা ভুল হবে। যদিও তোমরা কখনো কখনো নিজেদের কাপড় সেলাই করেছ কিংবা কখনো কারুর কাপড় কেটেছ অথবা কখনো একটি হাঁড়ি বা মৃৎপাত্র বানিয়েছ কিংবা কারুর জামায় বা টুপিতে ফুল তুলেছ। কুরআন মজীদ পড়ে কেবল দু'চারটি বই হাতে করেই পালালে যে, এর মসলা-মাসায়েল এবং এসব কিতাবাদি কেন লেখা হল তার কারণ সম্পর্কে অবহিত হলে না, এ কি কোন যোগ্যতা হল? যদি কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে তো তোমাকে কিতাব খুলে বসতে হবে (বই পুস্তক ও কিতাবাদি না দেখে তুমি কিছুই বলতে পারবে না)। অতএব তোমাদের কর্তব্য হল যে কাজের দিকে ঝুকবে তা সে কাজ যত কঠিনই কেন না হোক সে কাজ ভালভাবে করবে ও অভিজ্ঞ হবে।

বর্তমান যুগের মেয়েদের যে অবস্থা তাঁর মতে, বাপ-মা'র পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণই এর জন্য দায়ী। তিনি লিখছেন ঃ

"এখন বাপ-মা নিজেরাই তাদের সন্তানের তাবেদারী ও হুকুম বরদারী করছে। তাদের ইচ্ছা-আকাংক্ষাই তারা পূরণ করছে। তাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা

দিয়ে রেখেছে। নিজেদের ইচ্ছা-অভিরুচির ওপর তাদের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ছেলে-মেয়ের মন ভার কিম্বা মুখ বেজার দেখতে বাপ-মা রাজী নন। কোন্‌টা ভাল আর কোনটা মন্দ তা ছেলে-মেয়েদের বুঝান না। তাদের দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে না। ছেলে-মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। এরপর কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা তাদের পিতামাতার নিয়ন্ত্রণে থাকবে? ফলে অনিবার্যভাবেই এর পরিণতি তাই হচ্ছে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাধারণভাবে এর পরিণাম ফল হল এই যে, মেয়েরা আজ অত্যন্ত স্বাধীন ও বেপরোয়া। তারা যা চাচ্ছে তাই করছে। না বাপ-মা'র ভয় আছে, আর না আছে আল্লাহ্‌র ভয়। তাদের না আছে লজ্জা-শরমের ভয় আর না আছে লোক-নিন্দায় ভয়। সম্মান ও সম্ভ্রম হারাবার ভয়ও এদের নেই। আর আত্মমর্যাদাবোধের পরোয়াও এদের নেই। সৎসঙ্গ সম্পর্কে এরা অজ্ঞ। খেল-তামাশার প্রতি এদের আগ্রহ প্রবল। ঘুরে বেড়াতে এরা উস্তাদ। নভেল-নাটক এদের একমাত্র উপজীব্য। গালগল্প ও কেস্‌সা-কাহিনীর জন্য এদের জান কুরবান। কুরআন-হাদীসের নাম শুনলে এরা বেজার হয়। ভাল কাজ করতে বললে অলসতা দেখায়, পক্ষান্তরে খারাবের দিকে, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। কটু-কাটব্য করতে, ছিদ্রান্বেষণে, শত্রুকে বন্ধু ভাবতে ও বন্ধুকে শত্রু করতে এরা পারদর্শী। এদের মেযাজ তিরিক্ষী। যে কোন চালচলনে অভ্যস্ত হতে এদের সময় লাগে না এবং যে কোন পথ ধরতেও এদের বাঁধে না।"

শ্বশুরবাড়িতে নববধুর প্রয়োজনাতিরিক্ত লজ্জা-শরম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"কেবল বিয়ের কনে সেজে থেকো না। লজ্জা-শরমের জায়গা দেখে লজ্জা কর। কোন ব্যাপারেই বেশী বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। বড়দেরকে আদবের সাথে সালাম করে বসে যাবে। আর যাদের থেকে পর্দা করার দরকার তাদের থেকে পর্দা করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লজ্জার দ্বারা সবকিছু বিগড়ে যায়।"

স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, কী রকম আচরণ করবে সে সম্পর্কে এক জায়গায় অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন ঃ

"স্বামী যখন ঘরে ফেরেন সাথে সাথেই তার সামনে সমস্যা-সংকটের, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা তুলবে না। জানা নেই কোন্‌ চিন্তা মাথায় নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেছেন আর এর ফলে কোন্‌ ভাবনায় তিনি পড়বেন। যখন খেতে বসেন তখন তার সামনে এমন চিত্তহারী কথা বল যাতে তিনি সন্তোষের সঙ্গে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারেন। নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় ডাল-ভাতও গোশ্‌ত-পোলাওর মত মনে হয়। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাযুক্ত মনে অতি সুস্বাদু খাবারও তেতো মনে হয়।

অভিজ্ঞতায় এগুলো সুপ্রমাণিত। অনেক মহিলাকে দেখা যায়, স্বামী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরল, আর অমনি ঘরের সব অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-সংকটের তালিকা স্বামীর সামনে খুলে বসল। ফলে স্বামী বেচারার পক্ষে উঠা-বসা, খানাপিনা সবকিছুই দুর্বহ হয়ে ওঠে। তিনি অভুক্ত কিংবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় খাবার ছেড়ে উঠে পড়েন। এতে আল্লাহ্ পাকও খোশ হন আর নাখোশ হন মহিলাটির স্বামীও।"

সন্তানদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় লিখছেন ঃ

"এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সন্তানের প্রতি ভালবাসাই সব কিছু শেখায়, কিন্তু শর্ত হল বুদ্ধি, সুনীতি ও সদাচরণের। বদনীতি ও অসদাচরণ তাকে ও তার সন্তানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। শিশুর প্রতিপালন হয়ে বটে কিন্তু তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটে না, সে পশুই থেকে যায়। সে জানে না কখন চুপ থাকতে হয় আর কখন কথা কইতে হয় এবং কিভাবে কইতে হয়। ফলে যখন কথা বলার সময় তখন চুপ থাকে আর চুপ থাকার সময় যা খুশী বলে বসে। না সে কিভাবে খেতে হয় তা জানে আর না জানে পানের নিয়ম। তেমনি সে কাপড় পরার তরীকাও জানে না।"

শিশুদের প্রশিক্ষণ হবে কিভাবে সে ব্যাপারে কতিপয় মূল্যবান মূলনীতি তিনি পেশ করেছেন ঃ

"বাচ্চাদেরকে অসৎ সঙ্গ থেকে দূর রাখো। সব সময় খেয়াল রেখো, তার তবিয়ত যেন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট না হয়। জিদ ধরলে তার সামনে নতি স্বীকার কর না। আর চাইবার আগেই তার ইচ্ছা পূরণ করে দাও যাতে তার ভেতর যেদ সৃষ্টি না হয়। তার সঙ্গে আচরণে-পরিস্থিতির দিকে এতটা খেয়াল রাখবে যাতে তোমার থেকে নির্ভয় না হয়ে যায়। তোমার ইশারাই যেন যথেষ্ট হয়। খুব বেশী মারধোর করবে না কিংবা বকবে না। এতে সে বেহায়া হয়ে যাবে। ব্যস! ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ কর। সব সময় বাঁকা কথা বল না। ছোটখাটো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে তাকে বুঝিয়ে বল (যে, এটা করতে নেই কিংবা এ ধরনের বলতে নেই।) ক্রোধান্বিত অবস্থায় এমন বাজে ও বেহুদা কথা বল না যাতে সারা জীবন তোমাকে পস্তাতে হয়। তার কথা শুনে কিংবা তার পক্ষ হয়ে কাউকে গাল-মন্দ বল না, বরং এ বিষয়ে তাকেই দোষী ও অপরাধী ভেবো। তার কথা বিশ্বাস কর না। শিশুকে প্রহার করার পরক্ষণেই হাসবে না এবং তাঁর সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলবে না। এতে তোমার প্রতি তার যে সংকোচ ও

সম্ভ্রমবোধ ছিল তা উঠে যাবে। তুমি যে তাকে ভালবাস তা তার সামনে প্রকাশ কর না। কোন ব্যাপারে তার প্রতি তুমি অনর্থক ও অহেতুক পক্ষপাতিত্ব কর না। সমস্ত ছেলে-মেয়েকেই এক নজর ও এক দৃষ্টিতে দেখবে। একের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার কিংবা প্রাধান্য দিবে না। এতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত শিশুটি অন্যদের ছোট ও অবজ্ঞেয় ভাবতে শিখবে। বাচ্চারা যা চাইবে তাই পূরণ করা বড় রকমের ভুল। একে ভালবাসা বলে না, বরং এ শত্রুতারই নামান্তর।"

'কাজের বেটি ও পরিচারিকাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বলেন ঃ প্রত্যেক দোষ-ঘাটেই তাদের তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা কর না। তাদের কাজে তোমরাও এক-আধটু সাহায্য-সহায়তা কর। প্রয়োজনের সময় তাদের দিয়ে অহেতুক ও অর্থহীন কাজ করাইও না। যখন সময়মত কাজ হবে না তখন বকলে সে উল্টো তোমাকেই দু'কথা শুনিয়ে দেবে। এরপর তোমার আর রইল কী? আর তুমি যদি চাও যে, কাজও সময়মত হোক এবং কোন জিনিসও যেন নষ্ট না হয় তাহলে সুপারভিশনের জন্য মওকাতেই বসে যাও। কিন্তু তাকে একথা বুঝতে দিও না যে, সে কোন কিছু চায় কি না কিংবা চুরি করে কি না- তা তদারকির জন্যই বসেছ।

কাজের অভ্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ "সব কাজেরই অভ্যাস থাকা ভাল, কোন সময় বেকার থেকো না। বেকার যারা তাদের অধিকাংশকেই দেখেছি তারা সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। যদি বাসা-বাড়িতে কাজের লোক থাকে তাহলে ভাল নইলে অগত্যা স্বামী বেচারাকেই নিজ হাতে করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয়। কি নিদারুণ লজ্জা যে, বিবি বসে কিংবা শুয়ে আর ওদিকে স্বামী অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করছেন!"

"কতিপয় উপদেশ শিরোনামে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছেন। এখানে তারই কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি যদ্দারা কেবল মেয়েরাই নয়, নারী-পুরুষ সকলেই উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

"সমান দু'জন। কিছু দিতে চাইলে উভয়কে সমান দাও। একজনকে বেশী কম দিলে লোকে তোমাকে বেকুফ বলবে। আর যে কম পাবে সে অপমানিত বোধ করবে। দু'জনের সামনে একজনকে প্রশংসা করবে না। করতে হলে দু'জনেরই প্রশংসা করবে, খাতির-যত্ন উভয়কে সমান করবে। কারুর মন ভেঙো না। অন্যের সঙ্গে অপরিচিতের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর না এবং তার কাছে কিছু আশাও কর না। যদি তোমার ধারণা মুতাবিক সে না হয় তাহলে শেষে তোমার কষ্ট বাড়বে।

کہاں رہتی وہ قیمت جہاں چینی میں بال آیا

"কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্ত ভালবাস। কথা বললে মওকা বুঝে বল। খাওয়ার সময় কাপড়ের প্রসঙ্গ তুলো না। তাহলে ব্যাপারটা "ধানের হাটে ওল নামানো" প্রবাদ বাক্যের মতই দাঁড়াবে। একজনের কথা শেষ হলে তারপর তুমি কথা বল।

"কেউ যদি তোমার প্রতি মানবতাবোধ কিংবা ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা অন্য কোন ধারণায় তোমার কোন কাজ করে দেয়, তাহলে সেই কাজের ভেতর খুঁত ধরতে চেষ্টা কর না কিংবা ত্রুটি খুঁজে বের কর না। উপকারীর উপকারিতা স্বীকার কর।"

"যাকে পর্দা করা দরকার তার থেকে ভালভাবে পর্দা কর। নিজের চেহারা ঢেকে রাখবে অথচ নিজের গলার স্বর অন্যকে শোনাবে, এটা কোন ভাল কথা নয়। গলার স্বর দ্বারা কোন মানুষের চেহারা অনুমান করা যায়। বদ অভ্যাস ও খারাপ স্বভাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, দাঁত দিয়ে নখ্ কাটা, আঙ্গুল ফোটানো, মজলিসে আঙ্গুল খুচানো, মাথা কুটা, মাথা ঠোকা, সবার সামনে খোঁজাখুঁজি করা, কথা বলার সময় হাত কচলানো, মাথা ও ঘাড় ঘোরানো এর সবগুলো বেহুদা অভ্যাসের অন্তর্গত।

"সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ঠিক নয়, লোকে বেকুফ ভেবে তোমাকে লুটেপুটে খাবে। এরপর তুমি তা কেবল তাকিয়ে দেখবে। অতি ভাল মানুষী ও অজায়গায় উত্তম ব্যবহার বেকুফীর অন্তর্গত।

পরিশেষে দো'আ ও নিয়মিত আমলের কথা বলতে গিয়ে অন্তিম পরামর্শ দিচ্ছেন ঃ

"তুমি দুনিয়ার সব কাজ কর এবং সারাদিন দুনিয়ায় ধান্ধায় মেতে থাক। পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়। যদি কিছু সময় দো'আর জন্য বের করে নাও তাহলে তা তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও উপকারিতা বয়ে আনবে। তুমি আল্লাহ্‌র যিম্মায় ও আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে হয়ে যাবে। এসব দো'আর বদৌলতে আমি এমন সব (সম্পদ ও নে'মত) লাভ করেছি যা কেবল আমিই জানি। আমি সেই নে'মতদাতা করুণা নিধান মহাপ্রভুর কোন্ মুখে ও কোন ভাষায় শুকরিয়া আদায় করব।।"

میں کس قابل تھی اے لوگوں جہاں میں
مگر سب کچھ دیا اس نے بلا کے

কী যোগ্যতা ছিল আমার

মুরোদ বল্‌তে কীইবা ছিল?
কিন্তু মহান দাতা মালিক
নিজেই ডেকে সবই দিল।

স্নেহ ও করুণার প্রতীক

সাইয়েদ আবূ বকর হাসানী

মরহূমা (খায়রুন নেসা) সম্পর্কে আমার চাচী ও ফুফু হতেন। তদীয় পুত্র মওলভী আবুল হাসান আলী আমার সমবয়সী ও সহপাঠী হবার দরুন, তদুপরি আমরা উভয়ে একই বাড়ি এবং দীর্ঘকাল যাবত একই স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছি ও কাল কাটিয়েছি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছি বিধায় তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি এবং তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার স্বাদ পেয়েছি।

মরহূমা ছিলেন আপাদমস্তক স্নেহ-করুণার মূর্ত প্রতীক। তাঁর মেযাজে রুঢ়তা ছিল না আদৌ। তবে হাঁ, আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা এবং কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা ছিল তাঁর মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান। নইলে সাধারণত তিনি সবার প্রতিই সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, মুখে স্মিত হাসি, বিনয়ী, লাজনম্র, মৃদু আওয়াজ, সর্বপ্রকার চিত্ততোষণ, সকলের উপকার করা এবং সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থেকে তাতে অংশগ্রহণ এসবই ছিল তাঁর স্নেহ-মমতার প্রকাশ ও প্রীতি-ভালবাসার স্বাভাবিক দাবি। এই দাবি যদি ভবিষ্যত অনিবার্য পরিণতিকে পরিপাটি করার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে এটাই নির্ভেজাল আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। আম্মা-বী'র মধ্যে এই সমস্ত দাবি ও প্রকাশ ছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই। তাঁর দৃষ্টি সব সময় ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবেই পরিচালিত হত এবং এজন্যই অসহায় ইয়াতীম, নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র ও দুর্বল মজলুমের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল প্রসারিত। দুঃস্থ গরীব দেখলেই মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে উঠত, মমতায় কাছে ডাকতেন, সব খবর শুনতেন, স্নেহ-মমতার পরশ বুলাতেন, ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন, অভুক্ত হলে খাওয়াতেন, প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেন। শিশু কাঁদলেই, তিনি কান খাড়া করতেন। লাফ দিল, পড়ে গেল, কোলে তুলে নিতেন। আয়ত্ত্বে আসছে না, শিশুর মা'কে ডাক দিতেন, তাকে ধমক দিতেন, সতর্ক করতেন, শিশুর প্রতি খেয়াল না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করতেন, তারপর শিশুকে তার কোলে তুলে দিতেন।

ইয়াতীম শিশুর বিষণ্ন চেহারার ওপর চোখ পড়লে দিল কেঁদে উঠত, তাকে কাছে ডাকতেন, কথা বলতেন, সান্ত্বনা দিতেন, খুশী করতেন। মজলুম কাঁদছে, দেখতে পেলেন। চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে, ফুলে ফুলে কাঁদছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেন। প্রকৃত ব্যাপার জানতেন। যে বাড়াবাড়ি করেছে, জুলুম করেছে তাকে ডাকতেন, লজ্জা দিতেন, আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তির কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার আদায় করতেন, তারপর বিদায় দিতেন।

মেহমান এসেছে, মুসাফিরের আগমন ঘটেছে। সাথে সাথে খানাপিনা ও শোবার ব্যবস্থা করতেন। যাবতীয় এন্তেজাম সম্পন্ন হবার পরই কেবল নিশ্চিন্তে বসতেন।

তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। সেজন্য সবার কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক ভাবনা। তিনি বরাবর চেষ্টা করতেন মানুষকে এমন কথা বলতে যাতে তার শেষ পরিণাম সুন্দর ও সঠিক হয়। মন্দ কথা ও কাজে তিনি কাউকে উৎসাহিত করতেন না, বরং এতে তিনি বিরক্তি বোধ করতেন ও দুঃখিত হতেন। কেউ অন্যায় করলে, অপরাধ করলে কঠিনভাবে তিরস্কার করতেন এবং তাকে সদুপদেশ দিতেন। তিনি সব সময় বলতেন, তাদেরই ভালোর জন্য আমি এমন বলি। আমি চাই না যে, কেউ সমালোচনার সুযোগ পাক। আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হোক। বাচ্চামেয়েদের একত্র করতেন, তাদেরকে নামাযের তাকীদ দিতেন। কালামে মজীদের তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করতেন। গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সূরা তাদের মুখস্ত করিয়ে দিতেন। এসব সূরা পড়লে কি লাভ হয় তা বলতেন, এর ফযীলাত বয়ান করতেন। পরে এসব মেয়েদের আবার দেখলে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন এবং যখন জানতে পারতেন যে, অমুক মেয়ে এতটি সূরা মুখস্ত করেছে তখন খুবই খুশী হতেন, তার জন্য দো'আ করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের ওজীফা বলে দিতেন। তিনি তাদেরকে কিভাবে বসবাস করতে হয়, মিলেমিশে থাকতে হয় তার তরীকা বাৎলে দিতেন। ভাল মেয়েদের সাথে চলার তাকীদ এবং খারাপ সংসর্গ এড়িয়ে চলার উপদেশ দিতেন। পরিবারের কোন ছেলে সামনে এলে তাদেরকেও তিনি এ ধরনের উপদেশ দিতেন।

বাইরে থেকে প্রিয় ও স্নেহভাজন কেউ এলে খুবই সমাদরে তাকে কাছে বসাতেন। স্বয়ং পায়ের দিকে সরে বসতেন এবং তাকে শিয়রের কাছে বসাতেন, তা সে যত ছোটই হোক না কেন। কিন্তু সে যদি বসতে না চাইত তাহলে

অগত্যা তিনি মাথার দিকে বসতেন বটে, কিন্তু কখনও পা ছড়িয়ে বসতেন না, এতে তাঁর যত কষ্ট কিংবা অসুবিধাই হোক না কেন। এরপর সে কেমন আছে, তার শরীর কেমন, এসব জিজ্ঞেস করতেন এবং যাদের কাছ থেকে সে এসেছে, যাদের সাথে সে থাকে, তাদের কথা জিজ্ঞেস করতেন।

কারুর অসুখ-বিসুখ হলে কিংবা কারুর অসুখ-বিসুখের কথা শুনলে তিনি তক্ষুণি ওষুধের কথা বলে দিতেন। তিনি ছিলেন আধা-ডাক্তার। বুদ্ধিমত্তার সাথে চিকিৎসা করতেন। মাঝে মাঝে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। গ্রীষ্ম মৌসুম হোক কিংবা বর্ষা অথবা শীত, সর্বাবস্থায় তিনি সকলের কথাই ভাবতেন। কারুর গরম লাগছে, পাখা এগিয়ে দিতেন। শীত লাগছে, মুড়ি দেবার জন্য লেপ কিংবা কম্বলের ব্যবস্থা করতেন। বৃষ্টির সময় কাউকে বাইরে যেতে দিতেন না। মেঘের গর্জন কিংবা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অন্ধকার রাত, এমতাবস্থায় কাউকে বাইরে বেরুবার কিংবা সফর করবার অনুমতি দিতেন না। হাট-বাজারেও যেতে দিতেন না। সব সময় তিনি খান্দানের শিশুদের কথা ভাবতেন। পায়ে জুতা আছে কি নাই, মাথায় টুপি আছে কি নাই। কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে না তো? ঝগড়া করছে নাতো? কারুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি কিংবা মারামারি করছে নাতো? বেশিক্ষণ খেলাধুলা করছে না তো? বাপ-মা'র কথা শোনে কি না, বড়দের সঙ্গে বেআদবী করছে না তো? মোটকথা, শিশুর প্রতিটি গতিবিধির দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ছেলে বড় হলে কিংবা মেয়ে সেয়ানা হলে তাদের সঙ্গেও এই আচরণ করতেন। তাদের ভুল-ত্রুটি ধরা ও তা শুধরে দেওয়া, বোঝানো, ওলী-বুযুর্গদের জীবনের ঘটনাবলী শোনানো, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে তাদেরকে কথা বলার আদব, খাওয়ার আদব, উঠাবসা ও চলাফেরার আদব খুবই মিষ্টি ও মোলায়েম ভাষায় শেখাতেন। আর এজন্যই তাঁর উপদেশগুলো মনের গভীরে স্থান করে নিত।

তাঁর স্নেহের পরিমাপ করুন! বয়স আশি অতিক্রম করেছে। দুর্বলতা খুব বেশি। প্রতি দিনই কোন না কোন অসুবিধা লেগে আছে। নিজে থেকে চলাফেরাও করতে পারেন না। বড়জোর কয়েক পা চলেন, আর এই কয়েক পা' চলতে গিয়েই তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমি দিল্লী থেকে বাড়িতে (তাকিয়া, রায়বেরেলী) এসে পৌঁছেছি। এসে ঐ দিনই আমার নিকটআত্মীয় মুহাম্মাদ ছানী হাসানীর আম্মার কাছে গিয়েছি। সেখানে অল্পক্ষণই বসেছি, দেখি তিনি আস্তে আস্তে ধীরপায়ে এগিয়ে আসছেন। আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে বললাম, চাচী

আম্মা! আপনি কেন কষ্ট করে এখানে আসলেন। আমি নিজেই তো আপনার খেদমতে যেতাম এবং এখনই যেতাম। তিনি বলতে লাগলেন, "জানি না তুমি কখন আসতে। আমি জানতে পারলাম তুমি এখানে আছ। মন চাইল, আমিই তোমার সাথে দেখা করে আসি। এতে অসুবিধা কোথায়? এখন আর আমি চলতে-ফিরতে পারি না, অক্ষম হয়ে গেছি। না হলে আমি সাথে সাথেই চলে আসতাম।" এই স্নেহের পরিমাপ করা যায় কী?

একদিন আমার মেয়ে হাফসাকে বললেন, "তুমি লিখতে জান না?" সে বলল, আলহ'ামদু লিল্লাহ! অল্প বিস্তর লিখতে-পড়তে পারি। তিনি বললেন, "তবে তুমি আমাকে সালাম পাঠাও না কেন? চিঠিপত্রও লেখ না"। সে বলল, আমি তো আগাগোড়াই লিখি, সালাম পাঠাই, কিন্তু আপনার পর্যন্ত কেউ সেই সালাম পৌঁছায় না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে। ও হাঁ, তোমার সূরা-কিরআত কিছু মুখস্থ আছে তো? ভাল কথা, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ করে ফেল। ঐ সব সূরার উপকারিতা এই। আমার কাছে এস। আল্লাহ চাহে তো আমি তোমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেব।"

শেষদিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিদায় নিয়েছিল। আর একথা মাত্র গুটিকয়েক লোকই জানত। এজন্য কিন্তু তিনি কখনো হা-হুতাশ করেননি কিংবা অভিযোগের একটি শব্দ বা হরফও উচ্চারণ করেননি। এসময় তাঁর এক মেয়ের বসতবাড়ির কয়েকটি অংশ নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছিল। সে সময় তিনি দৈনিক জিজ্ঞেস করতেন, কতটা কাজ হ'ল আর কতটা বাকী। একদিন তিনি মেয়ের মনস্তুষ্টির জন্য অন্যের সাহায্যে নতুন বাড়িতে হাজির হন এবং দরজা-দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ধরে ছুঁয়ে দেখেন ও অত্যন্ত খুশী হন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।

ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স তিরানব্বই-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল। দুর্বলতা ছিল সীমার অতীত। কিন্তু এরপরও দো'আ-দুরূদ পাঠ, নিয়মিত আমল ও ওজীফাসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোন গাফিলতি কিংবা জড়তা দেখা যায়নি। সন্ধ্যাবেলায় আসরের আগে নিয়মিত কুরআন মজীদের নির্বাচিত রুকূ তেলাওয়াতপূর্বক, না জানি কতজন আত্মীয়ের যার মধ্যে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই শামিল হ'ত, ঝাঁড়ফুক করতেন। এজন্য তিনি কখনো ক্লান্তির অভিযোগ করতেন না। আর ফুঁ একবার দিতেন না, কয়েকবার দিতেন। যারা এ অবস্থা দেখেছেন, দেখতেন, তারা এতেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠত। কোন কোন সময় তাঁকে বলা হ'ত, একবার ফুঁ দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি তা মানতেন না

এবং যত জনই আসুক না কেন সবাইকেই ঝাড়ফুঁক করতেন।

আমার শৈশব কালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। এথেকেই আপনারা জানতে পারবেন, তাঁর স্নেহ কেমন ছিল ও কী রকম ছিল। তাঁরই সন্তান, যিনি আলী মিঞা নামে বিখ্যাত (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থ ও জীবিত রাখুন এবং জাতি যেন অব্যাহতভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়। আমীন!), তখন ছিল বাচ্চামাত্র। না জানি সে কী করেছিল। তাঁর পরিবারে কর্মরত জনৈক চাকরানী একবার খুবই ক্ষোভের সঙ্গে এসে অভিযোগ পেশ করল যে, বিবিজী! আলী মিঞা আমার বাচ্চাকে মেরেছে। একথা শোনামাত্রই তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনরূপ সত্যাসত্য যাচাই না করেই তিনি চাকরানীর ছেলেটাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, "আলীকে মার"? কিন্তু তার হাত আর ওঠে না। ওদিকে চাকরানী বেচারীর অবস্থা তো কাহিল। সে তো এতটা আশা করেনি যে, তার বাচ্চাকে মারার কারণে আলী মিঞাকে মারা হবে, সে মার খাবে। সে তো চেয়েছিল কেবল শাসন। এদিকে আলী মিঞা বলল, "বিবি! আমি তো মারি নাই"। "না, তুমি নিশ্চয় তাকে মেরেছ।" এরপর তিনি চাকরানীর ছেলেটাকে লক্ষ্য করে বললেন, "মার! মারছিস না কেন? ঠিক তেমনি করে মার যেভাবে আলী তোকে মেরেছে।" কিন্তু এরপরও যখন সে মারতে রাজী হল না তখন বী- আম্মা আলী মিঞাকে বললেন, ঠিক আছে। আলী! তুমি ওর কাছে মাফ চাও, হাত ধরে মাফ চাও আর বল, ভবিষ্যতে আর কখনও এমনটি করব না। আলী মিঞা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছে। আর ওদিকে চাকরানী বেচারী লজ্জায় ও শরমে ঘেমে অস্থির। তার জীবনে এ ধরনের ঘটনা দেখা তো দূরের কথা, শোনার সুযোগও বোধ হয় ঘটেনি। আর গোটা ঘটনার সময় আত্মীয়-স্বজন সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল যার ভেতর লেখকও অন্তর্ভুক্ত।

গরীবের মা ও শিশুর ওপর এই স্নেহ- যার ভেতর দিয়ে তাদের চিত্তের ব্যথার উপশম ঘটিয়েছেন, অপরদিকে আপন সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা যার মাঝ দিয়ে তাকে পথভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করলেন। উভয়ের জন্যই এর ভেতর শিক্ষা রয়েছে। জানি না, এ ধরনের কত ঘটনাই ঘটত। আর তাঁর নিয়ম ছিল এই যে, যার ভেতরই দোষ দেখেছেন, ত্রুটি পেয়েছেন সতর্ক করেছেন, চাই সে তাঁর নিজের ছেলেই হোক কিংবা মেয়ে, নিকটাত্মীয়ই হোক কিংবা দূরের সব সময় সত্য কথা বলা, ন্যায় ও ইনসাফ করা এবং সবার প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

স্নেহ-মমতার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, অপরের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে অহেতুক

ক্রোধ প্রকাশ করবে না, কোমলতা প্রদর্শন করবে। অনন্তর তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, যেখানে অন্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় সেখানে তিনি শান্তি ও সমঝোতার পথ এখতিয়ার করতেন, তার ভুল-ভ্রান্তি ধরে দিতেন, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের দোহাই পেড়ে তাকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করতেন এবং কাজের কাজ করতেন যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে।

তাঁর স্নেহপূর্ণ আচরণের কথা যখন মনে পড়ে তখন বিস্ময়ে ভাবি যে, এই যুগেও আল্লাহ তা'আলা কেমন সব লোক পয়দা করেছেন!

আপনিও দেখুন। জীবনের শেষ দিকের ঘটনা। পিপাসা লেগেছে। নিজে থেকে চলতে পারেন না। কিন্তু তারপরও নিজের প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতে প্রস্তুত নন। হয়তো কোন মেয়ে সামনে এসে পড়ল এবং তিনি তার পায়ের শব্দ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি অমুক। বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। "কোন কিছু দরকার?" বললেন, না। "থাকলে বলুন।" বললেন, আয়েশাকে একটু ডেকে দাও। "পানির দরকার?" "তুমি কোথায় কষ্ট করবে।" মেয়েটি ঝটপট অগ্রসর হয়ে কাছাকাছিই কোথাও থেকে পানি এনে দিল। তিনি পানি পান করতে লাগলেন আর তার জন্য দো'আ করতে থাকলেন। বললেন, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে খুশী করুন, সুখী করুন। অনেকক্ষণ হয়, পিপাসা লেগেছিল। তুমি বিরাট কাজ করেছ। সুখী হও! আল্লাহ তোমার ওপর প্রসন্ন হোন।

আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা তাঁর যতটা খেদমত করেছেন তা রীতিমত ঈর্ষারযোগ্য। কিন্তু তিনি এতটা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি যথাসম্ভব নীরব ও নিশ্চুপ থাকতেন। একবার বিশ্রামের সময় তিনি অনুভব করলেন, কেউ তাঁর পা দাবিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা উত্তর দিলেন, আমি। "অন্য হাতটি কার?" বললেন, রাবে'আর। বললেন, আরে! তুমি কেন আমার হাত-পা দাবাচ্ছ? আচ্ছা, হয়েছে, যাও। আর দরকার নেই। ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে। তার ভাগ্যই বলতে হবে যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাঁর খেদমতের দুর্লভ সুযোগ সে লাভ করেছিল।

যদি এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে তা বিরাটকায় গ্রন্থের রূপ নেবে। সত্যি বলতে কি, স্নেহ-মমতার যেই রূপ তাঁর মাঝে লক্ষ্য করেছি তা দেখে আল্লাহ্‌র স্মরণ জীবন্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ রাব্বু'ল-আলামীন তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন!

▲✯▲